স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

কলিকাতা,

৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, গঙ্গাধর নিকেতন হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাটপ্রেসে

শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃতের মূল্য।

কাগজের মলাট—।৵০ ছয় আনা,

কাপড়ের মলাট—॥৵০ দশ আনা,

ডাকমাশুল—৴০ এক আনা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—শিলচর,

শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন,—গঙ্গাধর-নিকেতন, সিমলা, কলিকাতা।

শিক্ষা-পরিচর।

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাকারে বাঁধাই, প্রত্যেক ভাগের মূল্য দেড় টাকা স্থলে একটাকা নির্দ্ধারিত হইল, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ভাগের ডাকমাশুল দেড় আনা করিয়া লাগিবে। কিন্তু চরিতামৃতের ক্রেতাগণ শিক্ষা-পরিচরের প্রত্যেক ভাগ অর্দ্ধমূল্য আট আনায় পাইবেন। কাপড়ের মলাটযুক্ত চরিতামৃত, এবং শিক্ষা-পরিচর লইতে হইলে, গঙ্গাধর-নিকেতনে কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট ডাকমাশুল সহ মূল্য পাঠাইতে হইবে।

প্রকাশক।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর স্বহস্ত-লিপি।

সাধু লক্ষণং পাদ্মে।

যথা লব্ধোপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরি পাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ।
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণং॥
ত্যক্তাত্ম সুখ ভোগেচ্ছাঃ সর্ব্ব সত্ত্ব সুখৈষিণঃ
ভবন্তি পর দুঃখেন সাধবো নিত্য দুঃখিতাঃ॥

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

জন্ম ও বাল্যচরিত।

চরিতাখ্যায়ক মাত্রেরই উদ্দেশ্য এই যে, আখ্যেয় চরিতে বর্ণনীয় ব্যক্তির অবিকল একটী ছবি অঙ্কিত করিয়া জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। রচয়িতার নৈপুণ্য থাকুক আর নাই থাকুক, এই চিত্র মনোহর প্রাকৃতিক উপাদানে চিত্রিত বলিয়াই সমধিক সুন্দর, সুদৃশ্য ও সমাজের পক্ষেও বিশেষ উপকারক হইয়া থাকে। কৃত্রিম ফুলের রঙ্ যতই চাকচিক্যময় হউক না কেন, তাহা কখনও স্বভাব-জাত কুসুমের ন্যায় মনোজ্ঞ হয় না; ইহা নিশ্চয় যে, জীবন-নিহিত স্বভাবের মধ্যে বিশ্বশিল্পী ভগবানের দর্শন, আর কৃত্রিম উপন্যাসাদিতে অপূর্ণ মানুষেরই স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্যই বাস্তবিক জ্ঞানি-সমাজে জীবনচরিতের এত অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমিও এই একটী জীবন-চিত্র সমাজ-প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিতেছি। আমার এই চরিত্র যদিও একটী অপূর্ণ জীবনের প্রতিবিম্ব বা একটী পারিবারিক সুদিনের পূর্ব্বাভাস উষা মাত্র, তথাপি আশা করি, সাধুচিত্ত পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতার অনেক

লক্ষণ দেখিতে পাইয়া সুখী হইবেন। বাস্তবিক সকলে একবার চাহিয়া দেখুন, এই ভাগ্যবতীর আদি অন্ত সকলই অতি সুন্দর ও প্রীতি-প্রদ।

মুক্তকেশীর জন্মের বৎসর ইহাঁর পিতা মাতা কাছাড় জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর নামক একটী মণিপুরী পল্লীতে বাস করিতেন। তথায় মণিপুরী বালকদিগের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী বঙ্গবিদ্যালয় ছিল; মুক্তকেশীর পিতা তাহারই প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেই প্রফুল্লচিত্ত, আমোদপ্রিয় ও নৃত্যগীত-পরায়ণ কৃষ্ণভক্ত জাতির মধ্যে একটী কুটীরে বাস করিতেন। মণিপুরী যদিও এক অর্দ্ধ বন্যজাতি, যদিও প্রচলিত সভ্যতা বা বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক এখনও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইহাদের জাতীয়-জীবনের সৌন্দর্য্য অস্বীকার করা যায় না। মণিপুরীগণ সর্ব্বদাই ঘর বাড়ী পরিষ্কৃত রাখে ও অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে নিয়ত যত্ন করে, এবং জাতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহী থাকে। পুরুষেরা যখন সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত ও ঈষদ্রক্ত পরিষ্কৃত ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কর্ণে তুলসী বা অন্য কোন সপত্র মঞ্জরী ধারণ করিয়া বাহির হয়, তখন যেন দিব্য এক একটী ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়াই সমাদৃত করিতে ইচ্ছা হয়। আর মণিপুরী কুমারীগণও কাণে ফুল, হাতে বলয় ও পরি-ধেয় স্বজাতি-নির্ম্মিত অতি সুন্দর এক খানা পাইড়দার মোটা কাপড়, গাত্রে হাতকাটা কাল রঙ্গের অঙ্গাবরণ ও উড়নী এবং নাসিকায় অতি সরু একটী তিলক ধারণ করিয়া কখন কখন সদলে বাহির হয়। তাহারা চলিবার সময়ে কেহ হাসে, কেহ

গায়, কেহবা আমোদের কথা কহিয়া হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া ভূতলে পড়ে, এবং পড়িয়াই আবার উঠে, আবার গায়, অথবা আবারই হাসির মধ্যে যোগ দিয়া আমোদ বাড়ায়। এই হর্ষ, আমোদ ও প্রফুল্লতা অবশ্য সকল জাতির মধ্যেই আছে, কিন্তু অন্যত্র ইহা প্রচ্ছন্ন ও অনেকটা কপট সভ্যতার আবরণে আবৃত। যাহারা প্রকৃতির সন্তান, এবং যাহারা এখনও আদিম প্রাকৃতিক সরলতাতেই লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট, তাহারা অন্যের বিচার, রুচি বা বিধি-বিধান অপেক্ষা না করিয়া সরল প্রকৃতির ভাবেই ফুটে ও সেই সরল বিধানেই সুগন্ধ বিস্তার করে। ইহা কবিত্ব নয়,—পাণ্ডিত্যও নয়, ইহা প্রত্যক্ষীভূত একটী সুন্দর জাতীয় চিত্র। ইহার শোভা পবিত্র চক্ষে গ্রহণ কর, আপনিই আনন্দিত হইবে। আর কুৎসিত পাপচক্ষু ধর, তাহাতে নানা বীভৎস ভাব দেখিবে। ইহাদের নৃত্য-গীতের মধ্যেও এমনই একটী স্বভাব-সঙ্গত কমনীয়তা আছে যে, তাহাতে বিদেশীয় সভ্যতম জাতিদিগের দ্বন্দ্বীভূত রসময় নৃত্য বা অস্মদ্দেশীয় রঙ্গাঙ্গনে প্রবর্ত্তিত বারবিলাসিনীগণের কুৎসিত হাবভাবপূর্ণ নৃত্যগীতাদি তুলনীয়ই হইতে পারে না। নৃত্যের জন্য তিনটী স্থান প্রসিদ্ধ; প্রথম ধর্ম্মভূমি, দ্বিতীয় প্রমোদাগার, তৃতীয় রণক্ষেত্র। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রের নৃত্য অতি জঘন্য পাপ-পূর্ণ, যে হেতু ইহাতে মনুষ্য-বধের অসঙ্গত উৎসাহ সূচিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রমোদ-ভবনে ও বিলাসিতার পূতিগন্ধ না থাকিলে প্রশংসাই হইত, কিন্তু তাহা তদিচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্যই অবতারিত, সুভদ্রের দর্শনের অযোগ্য। লিখকের মতে প্রথমোল্লিখিত নৃত্যই

প্রশংসনীয় ও দেখিবার যোগ্য। সকলে পরিজ্ঞাত হউন, এই অর্দ্ধ-বন্য-জাতির রমণী-নৃত্য পবিত্রতর ধর্ম্ম-মণ্ডপে প্রবর্ত্তিত, এবং জাতীয় আদর্শ-ধর্ম্মভাবই তাহার প্ররোচক। আর মণিপুরী পুরুষগণও তাহাদের ধর্ম্ম-মণ্ডপে বা কীর্ত্তন-সভায় ভক্তির সহিত অতি প্রগম্ভীর ভাবে যে শ্রবণ কীর্ত্তন করে, তাহাও নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও দর্শনের যোগ্য। এইরূপ এক স্বভাব-সুন্দর জাতির মধ্যে মুক্তকেশীর পিতামাতা অতি সমাদরে অবস্থিত ছিলেন। মণিপুরীরা এই দ্বিজ-দম্পতীকে সতত দেবতার মত ভক্তি করিত ও অতি শ্রদ্ধার সহিত সময়ে সময়ে বিবিধ উপহার আনিয়া দিত; এবং তাঁহারাও এতজ্জাতীয় নর-নারী ও বালক বালিকাদিগকে সমাদর করিতেন। এই সময়েই মুক্তকেশীর পিতার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস উপজাত হয়, এবং মনে নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-জড়িত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। তখন বাহিরের কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় পতিপত্নী দুই জনেরই হৃদয় সদ্ভাবে চালিত হইয়া একতানে বাজিত ও একই সংগীত গাইত; দুইবেলা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া জীবনের সদ্ভাব ও হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করাই যেন ইঁহাদের একমাত্র ব্রত ছিল। ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থানভেদে অতি হীনতর জীবনও সরল, সুন্দর ও নিরতিশয় পবিত্র বলিয়া অনুমিত হয়। সেই স্বর্গীয় সদ্ভাবপূর্ণ অবস্থায় মুক্তকেশী মাতৃ-জঠরে স্থান পরিগ্রহ করেন। ভাবুক ও অন্তর্দর্শী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিতে পারিবেন, ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত এইখানে কেমন অপূর্ব্ব উপাদান—জনক জননীর আত্মার সার, দেহের সার ও প্রাণের গূঢ়তম সাহায্য লইয়া জীব-দেহের সৃষ্টি,

করে। ঈশ্বরের এই বিচিত্র সৃষ্টি-ক্রিয়ার উপর অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া ধরিলে কত অপূর্ব্ব রঙ্গই নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এইস্থলে জড়-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত জড়-প্রকৃতির মহিমা ও বিশ্ব-তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ বিশ্বাসী পুরুষেরা অবশ্য বিশ্ব-পতিরই হস্তের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। বাস্তবিক সতেজ জ্ঞানময় অন্তর্দৃষ্টি পরিচালন করিতে গেলে সমস্ত সৃষ্টির মূলে ও সমুদায় কার্য্য-কারণের অভ্যন্তরে প্রাণরূপী ভগবান্‌কেই দেখিতে পাওয়া যায়। লিখক সেই সর্ব্ব-কারন-কারণ ও বিশ্ব-প্রবর্ত্তক প্রভুকেই মুক্তকেশীর ও জন্ম গুহ্য সৃষ্টিক্রিয়ার মূলে সন্দর্শন করিয়া সানন্দ চিত্তে প্রণাম করিতেছেন। স্বভাব-সুন্দর বস্তু যদিও আকার-নিরপেক্ষ, যদিও ইহার স্থান অস্থান বিচার নাই, তথাপি ইহাও এক পরমসুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, পিতামাতার অতি সুন্দর সদ্ভাবপূর্ণ জীবন সংস্পর্শ করিয়া মুক্তকেশী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অদৃশ্য রত্নকোষে উপচিত হইবার চারিমাস পরেই ইহাঁর গর্ভধারিণী কিছুকালের জন্য তদবস্থায় মাতৃ-সঙ্গে স্বদেশে প্রস্থান করেন।

অতঃপর আমরা দেখাইব, এই ব্রহ্মপদ-নিঃসৃতা পবিত্র-জীবন-স্রোতঃ কিরূপে উদ্ভূত ও কোন্ কোন্ দেশ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত এবং কাহার নিকট কি প্রকারে সমাদৃত হইয়া গেলেন।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২০শে চৈত্র গঙ্গাস্নানের দিবস গর্ভ-বাস পরি-সমাপ্তি করিয়া সেই মহাবারুণী ও মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী-সমাশ্রিত পুণ্যদিনে ঈশ্বরের অন্তর্ভূতা এই স্বর্ধুনী ভূতলে অবতরণ করি-লেন। যে সময়ে পূর্ব্বাকাশ বিমল অরুণ-কিরণে সুরঞ্জিত ও

বিশ্বরাজের বন-উপবন নবোন্মেষিত কুসুমরাজীতে সুশোভিত, এবং প্রকৃতির গায়ক বিহঙ্গ-কুল সানন্দ অন্তরে উড়িয়া উড়িয়া বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত, সেই চিত্তপ্রসাদন শোভনতম সুপ্রভাতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নাছির নগর গ্রামে মাতা এই কন্যারত্ন প্রসব করেন। তৎসময়ে এই শিশুর মাতামহী দিনময়ী দেবী তৎক্ষণাৎ বাদ্যকর আনাইয়া বাদ্যোদ্যমে স্বীয় ভবন উৎসব-ময় করিয়া তুলেন, এবং নিজেরা উলুলুধ্বনি করিয়া সময়োচিত শুভ-সূচনা করেন। তৎপর গ্রামস্থ বন্ধুবান্ধব অনেকেই তদ্‌-বাটিকায় আগমন পূর্ব্বক এই নবজাত শিশুর প্রতি আহ্লাদ প্রকাশ করেন। গ্রামাদিতে এই সকল পরম্পরাগত সদ্‌ভাব বড়ই প্রশংসনীয়; কাহারও বাটীতে কখনও কোন আনন্দধ্বনি হইলে নিকটস্থ নর-নারী সকলেই তাহাতে উৎকর্ণ হন, ও সুসমা-চারের প্রতীক্ষা করেন।

সকলেই জানেন, বঙ্গের সূতিকাগার সম্যক্ অস্পৃশ্য থাকে এবং গৃহমধ্যে একটী গার্হপত্য অগ্নি সংরক্ষিত হয়; এই দুইটি প্রথাই প্রসূতি ও নবজাত শিশুর পক্ষে অশেষ কল্যাণিকা। আর আর গৃহপালিকাগণ কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই অতি সতর্ক-তার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ ও অবস্থিতি করেন। কখনও বাহির হইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্নিতে গাত্র ও পরিধেয়ের স্পৃষ্টদোষ সংশোধিত করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, আর উপমাতৃগণ সমস্ত রাত্রি এক একজন করিয়া দীপালোক সহ অতি সতর্কে জাগরণ করেন। এই সমস্ত প্রথা মুক্তকেশীর সূতিকাগারে অতি মাত্রায়ই রক্ষিত হইয়াছিল।

তৎপর ষষ্ঠ দিবসে যথারীতি ষষ্ঠীকৃত্য ও একাদশ দিবসে শুদ্ধাচারিণী মাতামহী গৃহতল ও গৃহভিত্তি লেপন এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি প্রক্ষালিত করিয়া সূতিকা-গৃহের সর্ব্বত্র গঙ্গোদক ও তুলসী-মিশ্রিত শান্তি-বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক গৃহের শুদ্ধীকরণ করিয়াছিলেন, এবং অতি শ্রদ্ধার সহিত বিধি-পূর্ব্বক তদ্দিনের ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করিয়া শুভ সূচনাও করেন। এই সকল শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানই হিন্দুর জাতীয় জীবন।

আবার প্রসূতির অশৌচাপগম হইলে একত্রিংশৎ দিবসে ব্রত ও জাত শিশুর কল্যাণার্থ দেবার্চ্চনা করাইয়া তদ্দিনে উপমাতৃগণ ও গ্রামস্থ বন্ধুবান্ধব দিগকে প্রীতি-ভোজন প্রদান করা হয়। এই-বসের কার্য্য অবস্থানুসারে বিলক্ষণ আড়ম্বর ও বাদ্যোদ্যমের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল।

তৎপর নবজাত শিশুটীকে আসিয়া দেখিবার জন্য বার বার অনুরুদ্ধ হওয়ায় পিতা পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে নাছির নগরে আগমন করেন, এবং তদ্দিবসেই গৃহকর্ত্রী মাতামহী দেবী গ্রামস্থ শূদ্র-ভদ্র ও বিপ্রবর্গের একটী প্রীতিকর সভা আহূত করিয়া বাদ্য ও মহিলাবর্গের গীতাদি মঙ্গলাচরণ সহ একটী অতি আনন্দকর ব্যাপার উপস্থিত করেন। নির্দ্ধারিত শুভলগ্নে মুক্তকেশীর স্নেহময়ী জননী আত্মীয় কুটুম্বিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া ক্রোড়স্থ কন্যা-রত্ন ভর্তৃ-ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। এইরূপে পিতা কন্যা মুখ শুভ-সন্দর্শন করিয়া উপস্থিত বিপ্র-বর্গকে নমস্কার করি-লেন। তৎপর সভাস্থ সকলের ও গৃহ কুটুম্বিনীগণের পান সন্দেশ ভোজন হইলে সকলে আনন্দিত হইয়া অনুষ্ঠান-কর্ত্রীর সদ্ভাবের

প্রশংসা ও পরস্পর হাস্য পরিহাস করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করেন। এই সকল আহ্লাদকর অনুষ্ঠানে স্বর্গীয়া চিন্ময়ী দেবীর পূজনীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় বড়ই রসিক ও অনুকূল ছিলেন। কেবল এই ব্যাপারে নয়, ইহাঁদের স্নেহ-পক্ষ যেন বিধাতারই নিয়োগানুসারে এই পরিবারের উপর সতত বিন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর দুহিতৃ-বৎসল পিতা পরবর্ত্তী দুর্গোৎসবের বন্ধোপলক্ষে আবার নাছিরনগরে আগমন করেন, এবং প্রিয়তমা পত্নী ও অতি আদরের দুহিতাটীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় পবিত্রতম জন্মভূমি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী কাস্তল গ্রামের বন্ধুবান্ধব দিগকে দেখিতে যান। তথাকার স্নেহ-প্রবণ পিতৃ-বন্ধুগণ অতি স্নেহ-পাত্রী ভারত-কুমারীকে সন্দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিত হয়েন। তত্রত্য বিপ্র-মণ্ডলীর প্রতিগৃহে এই স্নেহময় পুত্তলটী নীত হইলে প্রায় ঘরে ঘরে আনন্দ-ধ্বনি হয়। সকলেই জানেন, পূর্ব্ববঙ্গের এই রমণী-রসনার বাদন কিরূপ সুমিষ্ট। বাস্তবিক ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিত্তের আনন্দ প্রকাশের একটী অতি সুন্দর উপায়। অতঃপর ভারত-দুহিতা তাঁহার পিতার পিতৃ-বন্ধু জগমোহন রায় মহাশয়ের আনন্দ-ভবনে নীত হইয়াছিলেন। এই সুহৃৎ-পুর বা অমৃত-নিকেতনে পিতার একান্ত স্নেহকারিণী অনেক দেবী আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই এই স্বর্গ-কন্যার উপরে হৃদয়ের অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই শশব্যস্ত সমুল্লসিত জয়কার (উলুলু ধ্বনি) পাড়া প্রতিবেশিনীদিগকে সমা-

হূত করিয়া আনন্দ-সঙ্গীত, ধান্য-দূর্ব্বা-প্রদান ও অতৃপ্তভাবে শিশুটীকে এক ক্রোড় হইতে অন্য ক্রোড়ে সমাকর্ষণ প্রভৃতি সস্নেহ ভাবগুলি সংমিশ্রিত করিয়া যুগপৎ অনুভাবিত হইলে ঠিক তাহা যেন একটী দেবলীলা বলিয়াই হৃদয়ে আনন্দ হয়। আমরা এইস্থলে পাঠকদিগের মুখাপেক্ষা করিতে চাইনা, তাঁহারা এই সমস্ত বাহুল্য বর্ণনা বলিয়া উপেক্ষা করিতে হয় করুন। আমরা প্রেমের হাটে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, যে যে পথে ও যে যে প্রেম-পুরীতে এই স্বর্গীয় শিশু যাইয়া উপস্থিত হইবে, এবং যেখানে যেভাবে প্রেম-লীলা উপস্থিত করিবে, তাহাই পুলকিত হইয়া সন্দর্শন করিতে আমরা বাধ্য। যদি নিতান্ত ক্লান্তিবোধ না হয়, তবে কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়া ভাবুক পাঠকদিগকেও আমাদের সঙ্গী হইয়া, ঈশ্বরের এই প্রেমের রাজ্যে বেড়াইতে অনুরোধ করি। একটী পল্লী সম্মুখে দেখিলেই মনে করিতে হইবে, এইখানেও সুন্দর সুন্দর কতকগুলি নর-নারী আছেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহ আছে, মহত্ব আছে, স্বর্গীয় প্রেম আছে, মুখে হাসি আছে ও জীবনে আনন্দ আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, ইহার মধ্যে ঈশ্বরেরই অপূর্ব্ব স্বর্গীয়তা বিরাজমানা আছে। সুতরাং চক্ষুষ্মান্‌দিগের ইহা দর্শন করা নিতান্তই পুণ্য-ফল-প্রদ মনে করিতে হইবে। যাহা হউক, এই সুহৃৎ-পুরে অনেকেই কন্যা-টীর হৃষ্ট পুষ্ট অঙ্গ ও সুন্দর দেহকান্তি দেখিয়া ইহার ভাবী-সৌভাগ্য অভিব্যক্ত করেন, এবং পিতাও ইহাকে সুলক্ষণা দেখিয়া সদাই মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। পূর্ব্ব দিকের শুভ্রাকাশই অবশ্য সুপ্রভাতের-পূর্ব্ব লক্ষণ বলিতে হইবে।

ইহারই কয়েকমাস অতীত হইলে রীতিমত অন্নপ্রাশন করাইয়া দৌহিত্রী-বৎসলা দিনময়ী দেবী স্বীয় কন্যাও দৌহিত্রীকে সঙ্গে করিয়া কাছাড়ে জামাতৃ-সন্নিধানে প্রস্থান করেন। ইহাঁরও এই একটীমাত্র কন্যা ও একমাত্র জামাতা, সুতরাং তাঁহাদের সতত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ও প্রাণ-গত-সঙ্কল্প ছিল।

এই সময়ে মুক্তকেশীর পিতা তদানীন্তন শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ডিঃ ইঃ বাবু নবকিশোর সেন মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে স্কুলটী কৃষ্ণপুর হইতে সোণাবাড়ীঘাট বাজারে নীয়া স্থাপিত করেন। তথায় অতি বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্মানিত মুসলমান চৌধুরী মজুমদার দিগের বসতি ; ঐ উভয় বংশেরই ছেলেরা স্কুলে পড়িত। তাঁহারা এবং অন্যান্য যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান ছাত্র সেই স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সকলেই প্রত্যহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অন্ততঃ একবার তাহাদের পণ্ডিত-দুহিতাকে না দেখিলে তৃপ্ত হইত না। তৎপ্রদেশে ছোট ছোট কন্যা সন্তানকে "নেনা" বলে ; তাহাদের এই অত্যাদৃত প্রিয়-দর্শন নেনার প্রতি সকলেরই একান্ত আহ্লাদ ও আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তৎপর ক্রমে মুক্তকেশী যতই একটু বয়ঃ-প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন, ততই তৎপ্রতি ঐ সকল লোকের মনোগত আহ্লাদ আরও পরিস্ফুট ও সুব্যক্ত হইতে থাকে। ইহার জন্য প্রায়ই দুধ, কলা ও ইক্ষু প্রভৃতি বাল-ভোগ্য উপহার আসিত। বাস্তবিক তৎকালীয় এই সমুদায় বহিরাবরণ নিষ্কাশন করিয়া দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিবিধ উপায়ে ভগবানেরই অতি অপূর্ব্ব

করুণা আসিয়া এই বিপ্র-কন্যাকে সমাদৃত করিয়াছে। এই সকল জীব-তোষণের উপাদান সেই জগৎ-স্বামীরই বিভূতি।

ইতিমধ্যে একবার ইহাঁর দন্তোদ্গমের সময়ে শরীর কিছু রুগ্ন হইয়া পড়ে, তদবস্থায় চৌধুরী বাড়ীর ছেলেরা নিজের লোক ও হস্তী প্রেরণ করিয়া শিলচর হইতে ডাক্তর আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসার্থ সাহায্য করেন। আর এতদ্বিষয়ে স্কুলের অন্যান্য বালকদিগেরও নিতান্ত স্নেহপূর্ণ ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইয়াছিল। লিখক জানেন, গ্রামের লোক বড় সরল, তাহাদের তুষ্টি বা বিতুষ্টি সকলই সরলভাবে উন্মেষিত। তাহাদের হৃদয় স্বর্গীয় সরল বিধানেই ফুটে ও একান্ত সরলতার সহিতই সুগন্ধ দেয়। যাহা হউক তৎপর বহুদিন পর্য্যন্ত আর মুক্তকেশীর শরীরে কোন রোগ প্রবেশ করে নাই। সদা সুস্থশরীরে ও প্রফুল্লমুখেই ইনি সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

স্বর্গীয়াদেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

প্রাথমিক শিক্ষা।

শিক্ষা মানবীয় শক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জীবন সঞ্চার করে ও স্বর্গ-গমনের পথ দেখাইয়া দেয়। একমাত্র শিক্ষার প্রভাবেই লোক নানা বিষয়ে কৃতী, সুপণ্ডিত ও মানবীয় অনন্ত উন্নতির পক্ষে প্রধাবিত। জগতে শিক্ষা না থাকিলে আমাদের এই

ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস বা সেক্‌সপিয়ার গঠিত হইত না। আর ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য যোদ্ধৃ-প্রবর ভার্গবরাম বা তৎশিষ্য ভীষ্ম-দ্রোণের কথাও আমরা শুনিতে পাইতাম না, এবং বিবিধ রোগের হস্ত হইতে রক্ষারও কোন উপায় উদ্ভাবন হইত না। আর এত সুমিষ্টতান-লয়-বিশিষ্টসঙ্গীতও কেহ শুনিতে পাইত না, এবং এই যে বেদ,বেদান্ত ও অতি উচ্চ পরা-বিদ্যা,ইহারও কোন প্রসঙ্গ থাকিত না। কিন্তু পাঠক দেখুন, শিক্ষা জগতে কেমন সৌভাগ্য আনয়ন করিয়াছে। এই শিক্ষার বলেই তো লোক অযুক্ত বর্ণমালার ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিলজড়, অজড় এবং পরিশেষে অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। এমন অনন্ত উন্নতির উন্মেষণ-দ্বার শিক্ষা যিনি রুদ্ধ করিয়া রাখেন, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। নর হউন, আর নারী হউন, শশ্বদুমুক্ত-স্বর্গদ্বার শিক্ষা-ভূমিতে তাঁহাকে উপস্থিত করাই সদভিভাবকের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই পুর-দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেই অভীষ্ট লোকের মধ্য দিয়া ভগবৎ-প্রেরিত দৈবশক্তি আসিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া যাইবে, এবং উত্তরোত্তর অনন্ত উন্নতির গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিবে। সেই পুণ্যময় আলোকিত জীবন-বর্ত্মের নিম্নতম সোপানে স্বর্গ-কন্যা মুক্তকেশীকেও আমরা সম্প্রতি উপস্থিত করিতেছি।

যে সময়ে মুক্তকেশীর বয়স ষষ্ঠবর্ষে প্রবর্ত্তিত ও যখন পরিবার মধ্যে ব্যবহৃত প্রায় সমুদায় কথারই অর্থ তিনি বুঝিতে ও বলিতে পারেন, তৎকালে ঈশ্বর যেন তাঁহারই শিক্ষার জন্য একটী অতি উত্তম উপায় উপস্থিত করিলেন। অবশ্য কার্য্যত ঈশ্বরের হস্ত

কেহই দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু বাস্তবিক জীবনে ধারা বাহিকরূপে যাহা যাহা ঘটে, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়া বুঝিতে গেলে নিশ্চয়ই অবধারণ করিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর যাহা করিবেন এবং নিশ্চয়ই যাহা তাঁহার অভিপ্রেত, ঠিক তদনুকূলেই সমস্ত ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না চাহিয়া সকলে একবার আপন আপন জীবন-পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিলেই কথাটী প্রামাণিক কি না বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই সময়ে মুক্তকেশীর পিতা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগানুসারে শিলচর গবর্ণমেণ্ট সদর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসেন, এবং তদবধি ইনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া বন্ধুবর্গের সাহায্যে শিলচরে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন ও কন্যার শিক্ষার্থে বিশেষ যত্নবান্ হন। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছা, সকল সময়ে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহার অল্পকাল পরেই মুক্তকেশীর উপর হইতে একটী সুস্নিগ্ধচ্ছায়া সরিয়া যায়; ইহার অতি স্নেহময়ী মাতামহী ঠাকুরাণী ১২৮৫ সালের ৭ই মাঘ পরলোক গমন করেন। তখন মাতৃক্রোড়ে অপর দুইটী শিশু অবস্থিত থাকায় ইনি সম্পূর্ণরূপে পিতারই স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি পিতার সঙ্গেই ইহাঁর স্নান, আহার, নিদ্রা ও উত্থান হইত। এই অবস্থান-পরিবর্ত্তনে বাস্তবিক মুক্তকেশীর অত্যন্ত উপকারই হইয়াছিল। সতত পিতৃসন্নিধানে অবস্থিতি হেতু পিতা অবসরমতে প্রায়ই নানা প্রিয়-কথার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা ছোট ছোট সুমিষ্ট কবিতা ইহাকে শিক্ষা দিতেন। শীত ঋতুতে কখন কখন রাত্রিশেষে জাগিয়া অভ্যস্ত

শ্লোকাদি মুখস্থ পাঠ করিয়া পিতাকে শুনাইতে হইত। তৎপর রাত্রি প্রভাত হইলে পিতা স্বহস্তে কেশবিন্যাস ও পরিষ্কৃত বসন পরিধান করাইয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেন, এবং পথে পথে শুভঙ্করী-প্রবচন ও সুমিষ্ট কবিতা পাঠ করিতে করিতে সানন্দ-মনে সহাস্যমুখে মুক্তকেশী স্কুলগৃহে প্রবেশ করিতেন। সেই সময়ের কথা এখন অনেকের নিকট অবশ্য গল্প বা কল্পনার মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর;—পিতা অগ্রে অগ্রে, আর কন্যা দুইটী যেন জয়া বিজয়া অথবা লক্ষ্মী সরস্বতী, পুস্তক হস্তে সানন্দ-হৃদয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন। এবিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তকেশীর পিতৃ-সুহৃদ অনেকে আজিও শিলচরে বিদ্যমান আছেন। যাহা হউক এইরূপ যত্নে ক্রমেই ইহার শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। সকলেই জানেন, নিকটে কেহ পরিজ্ঞাতা বা সমীক্ষকারী থাকুন আর নাই থাকুন, অস্ফুট গোলাপ ফুটিতে ফুটিতেই অতি কমনীয় শোভা ও মনোজ্ঞ-গন্ধ বিস্তার করিতে থাকে। আর শুক্ল পক্ষের চাঁদ কলা কলা করিয়াই পূর্ণ শশধরে পরিণত হয়। এই সকল রূপক প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে মিশাইয়া চিন্তা করিতেও আনন্দ হয়।

মুক্তকেশী বাঙ্গালা ১২৮৯ সালে প্রাইমেরী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৩৲ তিনটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই দুই বৎসরে তিনি স্কুলে বাঙ্গালা ও ঘরে সংস্কৃত পড়িতেন। শেষ-বর্ষে আসাম বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহের ইনেস্‌পেক্‌টর উইলসন্ সাহেব ও কাছাড়ের তদানীন্তন অতি ধীমান্ ডিঃ কঃ নক্‌স্

উয়াইট সাহেব বাহাদুর শিলচর বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া দুই জনেই মুক্তকণ্ঠে স্কুলের বিশেষতঃ মুক্তকেশীর বিদ্যা-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। অধিকন্তু মহামতি উইল্‌সন সাহেব বিশেষ করিয়া বলিয়া যান যে, এই বালিকা তাহার সমশ্রেণীর বালক হইতেও উত্তম। বাস্তবিকও এইসময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে মুক্তকেশীর বেশ একটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল। আর সংস্কৃত মুগ্ধবোধেরও সন্ধি, শব্দ, কারক ও সমাস পড়িয়া তিনি শেষ করেন। কেবল বিদ্যাতে নয়, চরিত্রেও ইনি বিদ্যা-লয়ের সর্ব্বাগ্রগণ্যা ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গূঢ়রূপে অতি উপাদেয় চরিত্রও গঠিত হইতেছিল। মুক্তকেশী কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে জানিতেন না, বিদ্যালয়ের ছাত্রী সকলকেই ঠিক এক একটী ভগিনীর মত স্নেহ মমতা করিতেন। এ জন্যই সহপাঠিকাদিগের নিকট মুক্তকেশীর এত অধিক সমাদর ছিল; সেই সহচরীরা তাঁহাকে দেখিয়া সকল দিনই অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিত। এমন কি অনেক দিন সেই সরল-হৃদয়া বালসখীদিগের মধ্যে কে মুক্তকেশীর গায়ে ঘেঁসিয়া বা করস্পর্শ করিয়া বসিবে, সেই কল্পিত সুখ লইয়াই বিবাদ হইত। আহা সেই বিবাদ এবং হৃদয়-স্পর্শী ভালবাসা কি মিষ্ট ও কি বহুমূল্য পদার্থ! এই বাল-সখী দিগের মধ্যে বর্দ্ধাখাত নিবাসী রমেশ বাবুর কন্যা স্বর্ণময়ী ও নাছিরনগর নিবাসী রমেশ বাবুর কন্যা কুসুম-কামিনী প্রভৃতি মুক্তকেশীর নিকট অধিক আদরণীয়া ছিলেন। আর প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে কেবল বালিকা কেন, অতি বুদ্ধিমতী প্রাচীনাদিগের মধ্যেও

অনেকের নিকট মুক্তকেশীর সমাদর ছিল। বিক্রমপুর-নিবাসী কবিরাজ হরিমোহন সেন মহাশয়ের তাপসী ও অতি বুদ্ধিমতী ভগিনী কালীতারা সেনজা মহাশয়া প্রায়ই মুক্তকেশীকে স্বভবনে ডাকিয়া নিয়া অতি সমাদরে নানা কথা আলাপ করিতেন। কোন কোন দিন একান্ত প্রণয়িনীর ন্যায় দুই জনে একত্র বসিয়া কোন ধর্ম্মপুস্তক (রামায়ণ কিম্বা মহাভারত) পড়িতেন। সেই সময়ে সেনজা মহাশয়ার বয়স প্রায় ৪০, আর মুক্তকেশীর বয়স দ্বাদশ; এই অসামঞ্জস্যাবস্থাতেও কেমন করিয়া ইহাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও হৃদ্‌গত অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা অপরের বুঝিবারও সাধ্য নাই। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, স্বভাব-সুন্দর বস্তু অকারণে অথবা স্বল্প কারণেই সকলের প্রাণ মন তুষ্ট করিতে জানে।

এতদ্ভিন্ন তদানীন্তন কাছাড় স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু অভয়-চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অতি গুণবতী সহধর্ম্মিণীও মুক্তকেশীকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। ইহাঁর সহিত ভালবাসার আরও কথঞ্চিৎ অব্যক্ত কারণ ছিল; সেই ভাব বৈচিত্র্য বা প্রাণগত ভালবাসারই বলে তিনি কালে স্বর্গগতা হইয়াও মুক্তকেশীর সহিত সতত আধ্যাত্মিক-যোগে সম্মিলিতা ছিলেন। প্রায়ই স্বপ্নযোগে তিনি মুক্তকেশীকে দর্শন দিতেন ও কোন কোন দিন তাঁহার সঙ্গিনী হইবার জন্য সাদরে অনুরোধ করিতেন। যাহা হউক, মুক্তকেশীর ইহাও একটী নিতান্তই সৌভাগ্য যে, তিনি যখন যে অবস্থায় যেখানে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রশংসনীয়াও সর্ব্বজনের আদরণীয়া হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার

সেই সুন্দর দেহকান্তি, সুমধুর চরিত্র ও বর্দ্ধিষ্ণু বিদ্যানুরাগ বাস্তবিকই পূজার্হ। এতদ্ভিন্ন দানাদি সদনুষ্ঠানেও শিশুকাল হইতেই ইনি যেন একরূপ শিক্ষিতা ছিলেন। বাড়ীতে কখনও কোন ভিক্ষুক আসিলে, প্রিয়তম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ দ্বারা অতি সমাদরে দেয় তণ্ডুলাদি ভিক্ষুর হস্তে প্রেরণ করিতেন। একবার কাছাড় বর্ণারপুর বাগিচার ম্যানেজার বাবু দীননাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব ও প্রবর্ত্তনানুসারে শিলচর বালিকা-স্কুলের ছাত্রীগণ দীন দুঃখীদিগকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে কিছু দান করিতে প্রবৃত্তা হন। তাহাতে মুক্তকেশীর বড়ই আহ্লাদ দৃষ্ট হয়। তিনি সেই ক্ষুদ্র দান-সমিতিতে একটী অন্ধকে একখানা কাপড় কয়েকটী কমলা ও অপর কিছু খাদ্য প্রদান করিয়া মহানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যেন নানা উপায়ে এই বালিকাকে বিদ্যা, চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেই এই সকল সুযোগ উপস্থিত করেন।

অতঃপর বৃত্তিপ্রাপ্তির সময় অতীত হইয়া গেলে মুক্তকেশী স্কুলের পড়ায় ক্ষান্ত হইয়া বাড়ীতে কেবল সংস্কৃতই পড়িতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ এইরূপ করাতে ইহাঁর বিশেষ উপকারই হইয়াছিল, ইনি এই উদ্যমে অল্প দিন মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে অনেকটা অগ্রবর্ত্তিনী হন, এবং ইহাঁর বিদ্যানুরাগ ক্রমেই সুগুপ্তভাবে আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

বিবাহ।

বিবাহ মনুষ্যজীবনের একটী অতি প্রধান ঘটনা ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই বিবাহ বা দাম্পত্যবিধানই নর-নারীকে উচ্চ নৈতিক রাজ্যে বা বিশুদ্ধ সামাজিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করে। নরনারীর বৈধ ও বিশুদ্ধপ্রেম নরলোকে অতি দুর্ল্লভ ও নিতান্ত লোভনীয় বস্তু। ইহাতে সমাজে শান্তি ও পরিবারে অশেষরূপে কল্যাণ সন্দোহন করে। বিবাহিত চরিত্র-যুক্ত একটী পুরুষ বা একটী সতী নারী কোন এক পাড়াতে অবস্থিত থাকিলে, সেই পাড়া-প্রতিবেশীকেও তাঁহারা নিত্য পুণ্যালোক প্রদান করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে। সুতরাং নর-নারীর শুভ-সম্মিলন কেবল দম্পতীর নয়, সমাজের স্বর্গারোহণের অতি সুখদ এক সেতু। অত্যুক্তি নয়, মনস্বী ও বুদ্ধিমান্ পাঠক একটুকু তথ্যানুসন্ধান করিলে এই সকল কথার সত্যতা বৈবাহিক-চরিত্র-যুক্ত নরনারীর জীবন-পুস্তকের অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত দেখিবেন। বড়ই সুখের সংবাদ যে আমাদের পবিত্র কন্যা মুক্তকেশী এই দুর্ল্লভ বৈবাহিক সৌভাগ্য লইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা অখিল-বিশ্ব-প্রজাপতি ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া এই পুণ্যতমা দ্বিজ-কুমারীর বিবাহ বর্ণন করিতেছি।

সময়ে যখন মুক্তকেশীর বয়স দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিল,

তৎ সময়ে নানা স্থানেই ইহার বিবাহের প্রস্তাব হইতে থাকে। তন্মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার অধীন বুরুঙ্গার অন্তর্গত বেগমপুরনিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর সম্বন্ধে যে আলাপ হয়, তাহাই ইহার আত্মীয়বর্গ উত্তম বলিয়া অবধারিত করেন। এদিকে শরৎ বাবুর একান্নভুক্ত আর কেহ না থাকায় তিনি আপনিই আপনার কর্ত্তা ও আপনিই আপনার ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ বিবাহ করেন কি না, ইহাই তাঁহার এক তর্কের বিষয় ছিল। তাঁহার সেই নিঃস্ব ও নির্ব্বান্ধব অবস্থা দার-গ্রহণের অনুকূল কি না, ইহাই তিনি চিন্তা করিতেন। পরে স্বসম্পর্কিত আত্মীয়বর্গের বহুল প্রবর্ত্তনায় ও স্বগত অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু মনের মত পাত্রী কোথায় পাইবেন, তাহাই সময়ে সময়ে চিন্তা করিতে থাকেন। পরে অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন, সৎ পিতা মাতার সন্তান না হইলে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন না। আর অধিক ধনী লোকের কন্যা বিবাহ করিতেও ইঁহার একান্ত অনিচ্ছা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার স্বজেলাস্থ পরম বন্ধু ইটানিবাসী হরকিঙ্কর বাবুর একখানা চিঠির সঙ্গে (অন্য এক ভদ্র লোকের নিকট লিখিত) এই হৃদ্য ও রুচির অনুকূলবার্ত্তা পাইয়াই তাঁহার সকল ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া গেল। এই পত্র সম্বন্ধে পরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "পত্রখানি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম, তথাপি পড়িবার ইচ্ছা যায় না। এই পত্রের মধ্যে হৃদয় যেন একটী নূতন আকর্ষণ লাভ করিল।" বাস্তবিক পত্রের কোন মাহাত্ম্য নাই, বিধাতার নির্ব্বন্ধই এই অব্যক্তানুরাগ বা নূতন আকর্ষণের মূল।

নিয়তিই সমস্ত বিচার ও তর্কের সিদ্ধান্ত আনিয়া উপস্থিত করে। নাছির নগরের জয়চন্দ্র বাবু এই বিবাহের প্রস্তাবক, তিনিই পণ্ডিত মহাশয়ের সরল অভিপ্রায় সমন্বিত একখানা চিঠি হরকিঙ্কর বাবুকে প্রদান করেন, এবং তাহারই স্বাদুতা অতৃপ্তভাবে পুনঃপুনঃ শরৎ বাবু আস্বাদন করিয়াছিলেন।

কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছা ছিল, পাত্রটী বিএ পাশ করিলে বিবাহ দেন। ঈশ্বরেচ্ছাতে পরে তাহাই হইল, বিবাহের পূর্ব্বেই শরৎ বাবু বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাবী শ্বশুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। জয়চন্দ্র বাবুর সহিত দুই এক চিঠির পরেই কন্যাকর্ত্তা ও পাত্র উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চিঠি পত্র চলিতে থাকে। অহো সেই ভাবী প্রণয় অপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের গোপনীয় বার্ত্তা পত্রের মধ্য দিয়া প্রেরণ করা ও তদ্‌যোগে অনুকূলবার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়াতে যে সুখ, তাহা অন্তর্দর্শী ভাবুক না হইলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না। কেহ কাহাকে দেখেন নাই, একটী মুখের কথাও কেহ কাহার শুনেন নাই, তবু পরস্পরের মধ্যে কেমন বিশুদ্ধ ও ঘনীভূতপ্রণয় উপচিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষ নিতান্ত সরল না হইলে এরূপ অদৃষ্ট হৃদ্যতা কখনও সংগঠিত হইতে পারে না। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় যে, এস্থলে উভয়পক্ষ সম্পূর্ণ একটী বৎসর এই স্বর্গীয়তা উপভোগ করিয়াছিলেন। পরন্তু পাত্র পাত্রীর সুসংযত মনের ভাব হয়তো আরও শোভনতম ও সৌরভময়। সুপ্রেমিক শরৎ বাবুরই এক চিঠিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, বিবাহবিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের অভিমত স্থিরতর হইলে পাত্রপাত্রী বিবাহের পূর্ব্বেই হৃদয়ের গন্ধমাল্যদ্বারা পর-

স্পরের অজ্ঞাতসারে পরস্পরকে বরণ করিয়াছিলেন। সেই অন্তর্ব্বরণে অবশ্য আপনারাই আপনাদের প্ররোচক এবং আপনারাই একমাত্র সমাক্ষকারী সাক্ষী। অন্যের চক্ষু বা কর্ণ সেইখানে যাইতেও পারে না, মনেরও প্রবেশাধিকার নাই। কেবল বিধাতার নিয়োগানুসারে প্রেম-প্ররূঢ় চিত্তই স্বর্গীয় উপাদানে নীরবে আপনাকে আপনি গঠিত করে।

এই বৎসর মধ্যে কন্যাকর্ত্তা কলিকাতা হইতে বরের দুইখানা ফটগ্রাফ আনাইয়া দেখিয়াছিলেন। একখানা যজ্ঞসূত্র-শোভিত অনাবৃত শরীরের প্রতিকৃতি ও অপরখানা অতি সুদৃশ্য মুখাকৃতি মাত্র। এই চিত্রগুলি নির্জীব পদার্থ হইলেও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি আতর মাথান থাকায় তাহার আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র তদ্‌গন্ধে উপস্থিত বন্ধুবর্গকে আপ্যায়িত করিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে শরৎ বাবু মুক্তকেশীর পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া একখানা অতি সুন্দর বাঁধান সংস্কৃত শকুন্তলা পুস্তক ভাবী প্রণয়িনীকে উপহার প্রদান করেন। তাহাতে এই দুইটী শ্লোক লিখিত ছিল ;—

"অজ্ঞাত-চিত্ত-প্রসরাপ্যুদারা
অদৃষ্ট-রূপাপি সমর্চ্চনীয়া।
অশ্রোত্রগম্যাপি সুমিষ্টকণ্ঠা
সুহৃৎপ্রধানা প্রতিভাতি যামে॥

অব্যক্ত-ভাবাদনিবেদ্য-রাগং
সোৎকম্প-হস্তং সমধীর-চিত্তং।
তস্মৈহি সানন্দ-সমাদরেণ
সমর্পিতঃ স্যাদুপহার এষঃ॥"

'যিনি অজ্ঞাত-চিত্তবৃত্তি হইয়াও সরলা, অদৃষ্টরূপা হইয়াও সম্যক অর্চ্চনীয়া, এবং অশ্রোত্রগম্যা হইয়াও সুমিষ্টকণ্ঠা প্রধানা সুহৃদরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছেন; অপরিজ্ঞেয়াভিপ্রায় হেতু অনুরাগ জানাইতে না পারিয়া সকম্পহস্তে ব্যগ্রচিত্তে আনন্দ ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে এই উপহার প্রদত্ত হইল।'

অহো সেই অদৃষ্ট ও অনন্যানুভূত প্রণয় এবং প্রণয়োপহার কি অমূল্য পদার্থ। বিশেষতঃ ইহা বিলাসিনী রমণীকুলের অস্পৃশ্য অমূল্য রত্নালঙ্কার, বিদ্যার্থিনীদিগের কণ্ঠে পরাইবার নিমিত্ত ইহা হইতে আর অধিক মূল্যের ভূষণ জগতে কি আছে? পাত্রী যদিও লজ্জাবশতঃ ইহাতে প্রত্যুপহার কিছুই প্রদান করেন নাই; তথাপি লেখক মনে করেন সেই অনতি-স্ফুট গোলাপের অনুদ্গত পরিমলই তদবস্থায় অতি শোভনতম উপহার। সেই অন্তর্লীন লুকান সৌরভ ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেও পরম সুখ। আর শ্লোক দুইটীর ভাবেতেও অনুমিত হইতেছে, উপহার দাতা সেই অব্যক্তানুরাগেই পরমাপ্যায়িত।

তৎপর ক্রমে ক্রমে বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে পাত্র ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ের অভিপ্রায়ানুসারে শুভ বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ

পূর্ব্বক একটী শুভদিনে কন্যাকর্ত্তার আলয়ে দেশীয় প্রথানুসারে সধবা মহিলাগণ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক পান-খিলি প্রদান করেন। পিতা তদ্দিনেই স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লইয়া তদীয় আনন্দকুটীরে বর-কন্যার মঙ্গলার্থ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া শুভসূচনা করেন, এবং নিকটস্থ বন্ধুবর্গকে উৎসবে শুভাগমনজন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রদান করেন। ক্রমশঃ তদর্থ সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত এবং গৃহদ্বার অচিরে উৎসবোচিত সাজ-সজ্জায় সুশোভিত হয়।

পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে পাত্র ও তদ্ভাগিনেয় শ্রীমান্ রূপনাথ চৌধুরী কলিকাতা হইতে শিলচর প্রস্থান করেন। কিন্তু জাহাজ-চালকের শৈথিল্য হেতু নিরূপিত দিবসে তাঁহারা শিলচরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া পরিবর্ত্তন ক্রমে তাহার দুই দিবস পর ২৬শে আষাঢ় বুধবারে বিবাহের শুভদিন ধার্য্য হয়। তৎপর বিবাহের পূর্ব্বদিবস অতি প্রত্যুষে জাহাজ আসিয়া শিলচর-ঘাটে উপস্থিত হইলে কন্যার পিতার একজন সন্তানোপম ছাত্র সত্বর-গমনে বরের শুভাগমন বার্ত্তা আনিয়া দিলে, কন্যাকর্ত্তার আলয়ে মহানন্দ উপস্থিত হয়। সকলেরই নয়ন ও মন জামাতৃ-দর্শনে সমুৎসুক; তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুবর্গ ভৃত্য-গণ সহিত সেই নাদেয়পোতে উপস্থিত হন, এবং আনন্দ ও সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বরকে কন্যাকর্ত্তার গৃহে আনয়ন করেন। গৃহস্বামী সেই গুণ-নিধান অপূর্ব্ব মহারত্ন লাভ করিয়া অপার আনন্দে ভাসিলেন। কেবল তিনি কেন, এমন সময়ে জামাতৃ-দর্শন সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আহ্লাদকর; তৎ-কালে সকলেরই চক্ষু এক মুখ লক্ষ্য করে, কর্ণ একের কথামৃত

পান করিতে সমুৎসুক হয়। বিশেষতঃ উপস্থিত ব্যাপারে কোন পক্ষাপক্ষ ছিল না, একই খাত দিয়া গঙ্গা-যমুনার পুণ্য সলিল প্রবাহিত হইতেছিল; একই ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং ঐ বন্ধু-সমিতিতে সপ্রণয় মধুর আলাপ ভিন্ন বিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কটুকষায় আর কোন কথাই কাহারও বলিবার আবশ্যক হয় নাই। অতি অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই কন্যার পিতার অনুরোধে জামাতা স্নান-ভোজনের নিমিত্ত অন্তঃপুরে নীত হন। সকলেই জানেন, সেই পুর কেমন স্নিগ্ধ ও কেমন সুমিষ্ট জ্যোৎস্নালোক-সম্পন্ন। পাঠকগণ অবশ্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এই খানে যাইয়া শরৎবাবু বাস্তবিকই ঈশ্বরের অনুরূপ করুণা লাভ করিয়াছিলেন। কন্যাকর্ত্তা যদিও সামান্যাবস্থার লোক, যদিও ইহাঁর বাহ্যসম্পত্তি অধিক নাই, তথাপি মনের আহ্লাদ ও হৃদ্‌গত ভালবাসা কোন সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে ন্যূন বলিয়া লেখক মনে করেন না। দেখা গিয়াছে সেই দিন তিনি জামাতৃ-সেবায় অতি সামান্য বস্তু দিয়াও স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর উপাদেয়ত্ব দানীয়-সামগ্রীর আধিক্যের উপর নির্ভর করে না, দাতার মনোগত ভাব স্পর্শ করিয়াই এ অমৃত ক্ষরিত হয়।

এই দিবসই সায়ং সময়ে কন্যাকর্ত্তার বাস-গৃহ পুষ্পাদিতে সুশোভিত ও প্রধূমিত ধূপ-গন্ধে সৌরভিত হইলে প্রথম মাঙ্গলিক বাদ্য ও তৎপর বরকন্যার কল্যাণার্থ আনন্দময়ী বিশ্বজননীর পূজা হইয়াছিল। তাহার পর অধিবাস (বরকন্যাকে ধান্য দূর্ব্বা ও সুগন্ধি দান) হইলে বন্ধুবর্গের প্রীতি-ভোজন হইয়াছিল।

২৬শে আষাঢ় বুধবার প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা ও তৎপর প্রাচীন রীত্যনুসারে পিতৃদেবতাদিগের অর্চ্চনা হইয়া মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ও মহিলাদিগের ভোজন হয়। সায়াহ্নে বিবাহানুষ্ঠান, তাহাতে প্রথম বাদ্য, তৎপর সভাস্থ সকলকে সুগন্ধি আতর ও তাম্বুল প্রদান করা হয়। তৎপর বাবু প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত মহাশয় বিবাহ-সভায় বিবাহ-বিষয়ে হাস্য-কৌতুক-পূর্ণ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু বিবাহকাল উপস্থিত হওয়াতে প্রবন্ধের সমস্ত অংশ পাঠ হইতে পারে নাই; সভাস্থ সকলে বিবাহ-স্থানে উঠিয়া যান, এবং প্রকৃত কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হয়।

এতদ্দেশীয় বিবাহ পদ্ধতি এক অপূর্ব্ব ভাবময় দৃশ্য; ইহার গুরুত্ব ও ভাবুকতা বলিয়া শেষ করা যায় না। বরকে গন্ধ-পুষ্প-দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিবাহে বরণ করা হয়। এইরূপ কন্যাটীকেও সচন্দন পুষ্পে পূজা করিয়া সেই অর্চ্চিতবরে সমর্পণ করিবার বিধি। এই ব্যাপারে পত্নী শরীর, মন, নাম, গোত্র ও ভাবী সমস্ত জীবন লইয়াই পতি-কুলে প্রবেশ করেন। এইখানে ভারত-নারী পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; ইহাঁরা আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ বিষয়ে ভাবের এত উচ্চ আকাশে সমারূঢ়া যে, এতন্নিমিত্ত তাঁহাদের প্রকৃত মহিমা লক্ষ্য করাই অনেকের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। কি চমৎকার বিধান! ইহাতে লেখা পড়ার কায নাই, সাক্ষ্য গ্রহণ নাই, কোন দলিলাদি রেজেষ্টারি করিবারও আবশ্যকতা নাই, সুধু বিধানের বলেই দম্পতী আকল্পস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লন। পত্নী ধ্রুবতারার

প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে ধ্রুব! তুমি ধ্রুব অর্থাৎ স্থির হইয়া আছ। আমিও যেন পতিকুলে ধ্রুবা হই।" এইখানে ধ্রুবতারাকে আদর্শ করিয়া নারী পতিকুলে স্থিরত্ব কামনা করিতেছেন। আমাদের মুক্তকেশীর এই প্রার্থনাটী বোধ হয় বিধাতা অতি খাঁটিরূপেই পূর্ণ করিলেন। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঠিক একটী ধ্রুব নক্ষত্রের মতই পতির চিত্তাকাশে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৭শে আষাঢ় প্রাতে আবার শুভ-সূচক বাদ্য, স্ত্রী-আচার ও তৎসঙ্গে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করা হয়, এবং বরবধূ সমস্ত গুরুজনদিগকে একে একে অভিবাদন করেন।

এই শুভানুষ্ঠানে যদিও কোন বিষয়েই অধিক আড়ম্বর কিম্বা রাজসিকতা ছিল না, তথাপি বর ও কন্যা উভয় পক্ষেরই আত্মীয়-গণ পরমাপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক বাহ্য জাঁক জমক থাকুক আর নাই থাকুক, সরল ও সাধুহৃদয় লইয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতেই অপূর্ব্ব আমোদ হয়।

এই বিবাহোপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা কাছাড়ের তদানীন্তন মাননীয় ডিঃ কমিসনার নক্স উয়াইট্ সাহেব বাহাদুরকে গৃহ-জাত বিবিধ সন্দেশ উপহার প্রদান করেন। তাহাতে উক্ত সাহেব মুক্তকেশীর পিতা মহাশয়কে যে একখানা চিঠি লিখেন, তাহার অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ এস্থলে লিখিত হইল। এইরূপ এক বালিকার পক্ষে সভ্যদেশের সুশিক্ষিত একজন বিদেশীয়ের প্রশংসা অবশ্যই শ্লাঘ্যতম বলিতে হইবে।

শিলচর।

পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সমীপে।

আপনার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আপনি আমাকে যে সন্দেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সুযোগে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার অধীনে থাকিয়া বালিকা-বিদ্যালয় যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তজ্জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ছাত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া আপনার নিজ কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন; তজ্জন্য এই জেলার লোক আপনার নিকট ঋণী আছে। এইরূপ দৃষ্টান্তে নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করিবে, এবং এই সম্বন্ধে যতই বলা হউক না কেন, কিছুতেই অতিশয়োক্তি হইবে না। আমি স্কুলে আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি এবং তাহার উত্তরও শুনিয়াছি। তাহার অপেক্ষা অধিক বয়সের বালক হইতে অনেক বেশী পরিমাণে সে তাহার বুদ্ধি-শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

ইউরোপীয় রীত্যনুসারে আপনার কন্যার এখনও বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয় নাই বটে, কিন্তু তথাপি এই সম্বন্ধে আমি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। এই বালিকা-সম্বন্ধে ইহার স্বামী গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া পারেন না। মূর্খ নিরক্ষর ব্যক্তির পরিবর্ত্তে একজন সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী বালিকাকে জীবনের সঙ্গিনী পাওয়াতে তাঁহাকে বাস্তবিকই সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

১৩।৭।৮৪। জেঃ নক্‌স ওয়াইট ; ডিঃ কঃ।

এইরূপে স্থানীয় প্রধান রাজপ্রতিনিধি ও বন্ধু বান্ধবের প্রশংসাতে সংপূজিত হইয়াই দেবী বিবাহ-জীবনে শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিবাহ-সম্বন্ধে তাবৎ কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত হইয়া গেলে তৎপতি আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবকে অশেষরূপে আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় ভাগিনেয়ের সহিত কলিকাতায় প্রস্থান করেন। যাইবার দিবস অতি প্রত্যুষে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তখন জাহাজ ছাড়িবার কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া তৎপরিতোষের নিমিত্ত সেই পরিত্যক্ত আনন্দভবন হইতে স্নেহোপহার আসিয়া ছিল, এবং তাহার আস্বাদন করিয়া শরৎ বাবু সেই বিদায় সময়েও পর্য্যাপ্ত সুখানুভব করিয়াছিলেন। ইহার স্বল্পক্ষণ পরেই জাহাজ সমস্ত আরোহীকে লইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল। এই সময়ে শ্বশুর ও জামাতার পরস্পর শিষ্ট ব্যবহার ও প্রেম-নিরীক্ষণ বড়ই ভাবময় ও আনন্দপ্রদ। তৎপর শরৎ বাবু কলিকাতায় পঁহুছিয়া শ্বশুর মহাশয়কে এই ভাবে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, "আমি শিলচরে আপনার আলয়, আপনার আনন্দকুটীর ও আপনার পরিজনবর্গ যাহা দেখিলাম, সকলই আমার চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিলাম আপনার সকলই সুন্দর ও সকলই অতি অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ। এই ক্ষণে আমার মনে হইতেছে, যেন আমি বহু-পুণ্য-বলে কোন দেব-লোকে গিয়াছিলাম ; তথায় ২।৪ দিন থাকিয়া আবার এই দুঃখময় ও পাপময় নরলোকে আসিয়াছি।" এইস্থলে পত্রলেখকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া যে সুসৌরভ আসিয়াছে, তাহাই আঘ্রেয়। আমরা জানি,

প্রেমিকের চক্ষু সকলই সুন্দর দেখে। প্রেমিকের আত্মা সামান্য দৃশ্যেই স্বর্গ দর্শন করে, এবং সামান্য ভোগেই পরম তৃপ্তি লাভ করে।

এদিকে দেবী মুক্তকেশী বিবাহের সমস্ত গোলযোগ শেষ হইয়া গেলে আবার পূর্ব্ববৎ যত্নের সহিত পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবসরে তৎপতি শরৎ বাবুও পড়া শুনা করিয়া জ্ঞানপক্ষে আরও কিছু অগ্রসর হইতে অভিলাষী হয়েন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহার সেই মনোরথ লক্ষ্যের সীমাতে পঁহুছিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই অপরা বিদ্যার উপাসনা করিবারও ইহাঁর কোন আবশ্যকতা ছিল না; ইনি যে বিদ্যার জন্য মনোনীত ও যে শাস্ত্র ইহাঁর অনন্ত উন্নতির পথ প্রদর্শক, বিধাতার রাজ্যে তাহাই ইনি পড়িতে বাধ্য।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

পতিসহগমন ও তৎসহবাস।

দেবী মুক্তকেশীর এই গমন পিত্রালয় হইতে শ্বশুর রাজ্যে অথবা স্বামীর কর্ম্মস্থানে নয়। স্বামী শিশুকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব বিবর্জ্জিত হইয়া দেশ দেশান্তরে পরিচালিত ও উদাসীনবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল। তিনি এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র, আড়ম্বরশূন্য পবিত্র ছাত্রবেশেই এখনও ইহাঁর নিয়ত গতিবিধি। তাঁহার যেমন কোন বিষয় কর্ম্ম নাই, তেমনি রীতিমত কোন ঘর বাড়ীও নাই। তবে আছে কি? আছে মাত্র—তিনি একজন সৎ লোক, তাঁহার ইচ্ছা সৎ, প্রবৃত্তি মহৎ ও জীবনের লক্ষ্য অতি উচ্চ। যদি পুরাণ-বর্ণিত নাগরাজ-নন্দিনীর একজন অরণ্যচারী অথবা শ্মশানবাসী পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে কোন দোষ না থাকে, যদি জনকতনয়ার বল্কলপরিহিত বনবাস-যাত্রী পতির অনুগামিনী হইতে কোন দোষারোপ করিবার না থাকে, তবে এই সদাত্মার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বালিকাকেও আমরা কোন দোষারোপ করিতে চাহি না। এইস্থলে আমরা সুধু এই পণ্ডিত-দুহিতার জীবনানুসরণ করিয়া বিধাতার লিপি মাত্রই সংগ্রহ করিব। তিনি জীবনের কোন্ কোন্ বর্ত্মে কিরূপ সঙ্কল্প বা ধারণা লইয়া পদচারণ করিয়াছেন, নীরবে আমরা তাহাই দেখিব। তিনি বালিকা হইলেও বুদ্ধিমতী ও অতি সরল

তাঁহার পাদবিক্ষেপ বা জীবনের গতি অবশ্যই সুদৃশ্য ও দেখিবার যোগ্য।

বিবাহের পরবৎসর পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে জামাতা আবার তদীয় আলয়ে আগমন করেন। এই উপলক্ষে মুক্তকেশীর স্বসম্পর্কিত বন্ধু বান্ধব সকলেই অত্যন্ত আমোদিত হইয়াছিলেন। মুক্তকেশী নিজেও বিবাহের পর এই যাত্রা বাড়ী আসিয়া ইষ্টমিত্র সকলেরই নিকট অত্যধিক সমাদৃতা হইয়াছিলেন। পতি-পত্নী উভয়েই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদিগের বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া অশেষরূপে আনন্দ আহ্লাদ উপভোগ করেন। এইরূপে কিছুদিন অবস্থানের পর শরৎ বাবু প্রস্থানোন্মুখ হইলে এবার মুক্তকেশীও তৎসঙ্গিনী হইবেন বলিয়া প্রস্তাব উত্থিত হয়। এই অসময়ে পতির নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় ইহাঁর পতিসঙ্গে যাইবার কি আবশ্যকতা ছিল, তৎকালে যদিও ইহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বল্পদিন পরেই বিধাতার লিপিপাঠে ইহার সমস্ত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বর যাহার জীবন-লীলা যে প্রণালীতে পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তদনুকূলেই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং জীবের ইচ্ছা, রুচি ও প্রযত্ন তাহারই অনুসরণ করে। এই সকল গুহ্য জীবন-রহস্য বিচক্ষণ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটেই অবশ্য অধিক আদরণীয়। যাহা হউক, যাওয়া স্থির হইলে, পতি-সঙ্গে গমন করিয়া যে প্রকারে অবস্থান করিতে হইবে, ও সুখে দুঃখে এবং সম্পদে বিপদে যেরূপ অনুগতা থাকিয়া সতী-ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য, তত্তদ্বিষয়ে মুক্তকেশী পিতার নিকটে বিশেষরূপে

উপদিষ্টা হইয়াছিলেন। ইনি বালিকা হইলেও অতি বুদ্ধিমতী প্রবীণার ন্যায় অধোমুখে উৎকর্ণ হইয়া অভিনিবেশসহকারে পিতার সেই কথামৃত পান করেন। ইনি লজ্জাবশতঃ যদিও তৎকালে কিছু বলিতে পারেন নাই, কিন্তু ভাবতঃ ইহাই তাঁহার সুগম্ভীর মুখাকৃতিতে সুব্যক্ত হইয়াছিল,—"এ সমস্ত আদেশ ও উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, আমি স্বতঃই এই পবিত্র ধর্ম্ম পালন করিতে প্রস্তুত ও আকাঙ্ক্ষিনী।"

তৎপর পিতা নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলে, তাহার কিয়দ্দিবস পর কন্যাও পতি-সঙ্গে প্রস্থান করেন। কিন্তু স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও মায়ার কি অভাবনীয় শক্তি; ইনি সর্ব্বথা স্থিরমতি হইলেও গমন-সময়ে রোরুদ্যমানা জননী ও অতি আদরের শৈশব-সহচর ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে ইঁহার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছিল। ইনি বহুক্ষণ মাতার কণ্ঠলগ্না হইয়া অশ্রুবর্ষণ করেন। এই অশ্রু কি, মায়াইবা কিরূপ? আমরা এই জীবনচিত্রে এইমাত্র দেখিতেছি, এই সাধুশীলা বালিকা জীবনের আর একটী স্বর্গীয় সোপানে পাদ-বিক্ষেপ করিয়াও আবার ফিরিয়া ফিরিয়া ঐ মায়া-কাননের অধিষ্ঠাত্রী জননী ও চিরসহচরী স্নেহ-ময়ী ভগিনী স্বর্ণপ্রভার প্রতি সজলনেত্রে বার বার নিরীক্ষণ করিতেছেন। পাঠক একবার ইহা স্বচিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেখুন, কেমন সুন্দর দৃশ্য। অন্তরের ক্রিয়া ভাব-প্রবণ-চিত্তই ভালরূপ অঙ্কিত করিতে পারিবে।

জননীও অতি কষ্টে প্রাণের উমাকে বিদায় দিয়া শূন্য অন্তরে অবস্থিতি করেন। এই মনঃকষ্ট বহুদিন পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে অপসৃত

হইল না। ইনি কিয়দ্দিন পর কাছাড়ে যাইয়াও মুক্তকেশীর স্থান অপূর্ণ দেখিয়া সময়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেন। এই অশ্রু কেবল কতক টুকু জল বা মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবন্ধন গলিতবাষ্প নহে। ইহা করুণারূপিণী ঈশ্বরসঞ্চালিত প্রেম-গঙ্গা অথবা ভাবুক অন্তর্দর্শী মহানুভবদিগেরই সুপেয় অমৃত।

এদিকে মুক্তকেশীও মনঃকষ্ট সহন করিতে করিতে একটী নূতন জীবন-বর্ত্ম দিয়া পতি-সঙ্গে পঞ্চম দিবসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত খোরসেদপুর গ্রামে শরৎ বাবুর ধর্ম্মমাতা হরসুন্দরী দেবীর স্নেহময় আলয়ে উপস্থিত হয়েন, এবং ধর্ম্মমাতার মনঃ-প্রীতির জন্য কয়েক মাস এই স্থানে অবস্থান করেন। যিনি এ পর্য্যন্ত পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াতেই অবস্থিতা ছিলেন ও তাঁহা-দের হৃদয়-ক্ষরিত অমৃতই নিয়ত সম্ভোগ করিতেন, সেই স্নেহের প্রতিমা আদরের তনয়া এই বন্ধু বান্ধবশূন্য ও নিতান্ত অপরিজ্ঞেয় দূরতম রাজ্যে সুখে কি দুঃখে বাস করিয়াছিলেন, লেখক তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত নহেন। কিন্তু সুশীলা মুক্তকেশী পিতার নিকটে সর্ব্বদা ধর্ম্মমাতার গুণই চিঠিপত্রে ব্যাখ্যাত করিতেন। ইনি বাস্তবিকই নাকি অতি ধার্ম্মিকা রমণী ও তাঁহার হৃদয় নাকি বড়ই স্নেহার্দ্র। অহো ঈশ্বরের এই বিচিত্র সংসার উদ্যানে কত সুশ্রী ও কত সুগন্ধি ফুলই ফুটিয়া আছে, কে তাহার আঘ্রাণ করে? যাহা হউক, এই স্থানের জল বায়ু বোধ হয় বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। অল্পদিন পরেই মুক্তকেশী জ্বররোগে আক্রান্তা হইয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে ধর্ম্মমাতার অভিপ্রায়ানুসারে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান

ও সেই গ্রামস্থ বিপ্রবর্গকে ভোজন করাইয়া, তিনি স্বীয় গুণবান্ স্বামীর সঙ্গে পুঁঠিয়ায় প্রস্থান করেন। এই স্থানে স্বামী একটী নূতন কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইথানেও শরৎ বাবুর অনেক হিতকারী সুহৃৎ আছেন। সেই পূজার্হ সুহৃদ্দিগেরই স্নেহাকর্ষণে কিয়দ্দিন পতি-পত্নী উভয়ে তাঁহাদের আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার পর নূতন ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইলে নবদম্পতী তথায় যাইয়া অবস্থান করেন। এই সময়ে পিতা সততই চিঠিপত্রে প্রসঙ্গচ্ছলে মুক্তকেশীকে স্বামীভক্তি ও তৎ পরিচর্য্যা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপ স্বামী ও পত্নীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়ত যত্ন করিতেন। এইরূপ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া জলসেক করিলে নিশ্চয়ই সুফলের প্রত্যাশা আছে। দেবীর সরল আত্মা এই অভিনব সংসারক্ষেত্রে আসিয়াও স্বর্গীয় উপাদানই লাভ করিতে ছিল। অত্যুক্তি নয়, বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন, এই নবদম্পতীর সুমিষ্ট প্রণয়সৌভাগ্য তাঁহাদের সকলকেই আনন্দ দান করিতেছিল। শরৎ বাবু এতদিন গৃহশূন্য, পরিজন-শূন্য ও আমার বলিয়া আদর করে এমন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বিবর্জ্জিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলেন; সেই চিরভ্রমণশীল সাধু পুরুষকে ভগবান্ একটী উপযুক্তা সঙ্গিনী দিয়া এইক্ষণে গৃহবাসী করিলেন। অবশ্য এরূপ গৃহ সাধু সদাত্মাদিগের আশা-পূরণের স্থান নহে। সৈকতময় সমুদ্রতীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে নিশ্চয়ই তাহা ভগ্ন বা বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভব। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ বা ফলাফল গণনার এখনও কোন আবশ্যকতা নাই, প্রয়োজনানুরোধে জীবমাত্রেই এক এক-

রূপ আবাস অবলম্বন করিয়া থাকে, এই জায়াপতিও বহু আশার সহিত তাহাই করিলেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, এইখানেও মুক্তকেশীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া জীবনের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ক্রমে পতিপত্নী উভয়েই জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়েন। সমানে দুই বেলা অন্নপথ্য ইহাঁ-দের প্রায়ই ঘটিত না। অনশনে ও ঔষধ সেবনে আর কয়দিন শরীর অভগ্ন থাকিতে পারে? ক্রমেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। এই সংবাদে পিতা মহা দুঃখিত হইয়া পরবর্ত্তী পূজার বন্ধের সময়ে স্বীয় দুহিতা ও প্রাণাধিক জামাতাকে দেখিতে আই-সেন। তখনও উভয়েরই শরীর রুগ্ন ও কাতর, নিয়ত স্নান-পথ্য প্রায় কাহারও ছিল না। ইহা দেখিয়া পিতা স্বীয় দুহিতাকে নিজ কার্য্যস্থান শিলচরে লইয়া যাইতে প্রস্তাব করেন। তাহাতে মুক্তকেশী সম্মতা হন নাই; তিনি সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখ জ্বর-প্রধান রাজ্যে স্বীয় সহচরকে রাখিয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে অনিচ্ছু হইলেন। অথচ শরৎ বাবুও যে এসময়ে কার্য্য-স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, এমনও সম্ভব ছিল না। তখন সাধুশীলা কন্যা লজ্জাবশতঃ পিতার নিকটে চাক্ষুষভাবে কিছু বলিতে না পারিয়া একখানা কাগজে লিখিয়া এইরূপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, "আমি একা কিরূপে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি। যদি যাইতে হয় উভয়েই যাইব, আর না হয় উভয়েই এই স্থানে থাকিয়া মরিব। আপনি আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, সর্ব্বত্রই ঈশ্বর রক্ষা-কর্ত্তা।" দুহিতার এইরূপ সকরুণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া পিতা

অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ পূর্ব্বক পতিভক্তি ও তৎ-প্রতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার উপদেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে কার্য্যস্থানে চলিয়া আইসেন। এতদুপলক্ষে পিতা যে কয়দিন পুঁঠিয়া অবস্থিত ছিলেন, পতিপত্নী উভয়েই বিবিধরূপে ও মনের সাধে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং নিরতিশয় বিনয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া অশেষরূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করেন। কখনবা উভয়েই যুগপৎ তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া পিতার হৃদয়োত্থ স্নেহ-সমাদর সম্ভোগ করেন। আহা কি সুন্দর দৃশ্য—যেন দুইটী প্রণয়-বিহঙ্গ নিয়ত সুধাকরের সুধা-সমুদ্রে সন্তরণ করিয়া আপ্যায়িত। আরও দেখা গিয়াছে, ইহাঁরা কি দিয়া ভক্তিভাজন পিতাকে সন্তৃপ্ত করিবেন ও কোন কথাটী বলিলে পিতার মনে আহ্লাদ হইবে, ইহাই তাঁহাদের প্রাণগত যত্ন ও চিন্তার বিষয় ছিল। তৎপর পিতা প্রস্থানোন্মুখ হইলে মুক্তকেশী ছোট ছোট ভ্রাতা ভগিনী ও জননীর নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর পরিধেয় ও বিবিধ উপহার দিয়া তাঁহাকে বিদায় করেন।

মাতা অনেক সময়ে কন্যার বিচ্ছেদে ব্যাকুলা হইয়া ক্রন্দন করিতেন, একথা স্বর্ণপ্রভার পত্রে পরিজ্ঞাত হইয়া তদুত্তরে মুক্ত-কেশী লিখিয়াছিলেন, "স্নেহের স্বর্ণ! মা যাহাতে না কাঁদেন তোমরা সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিও। তোমরা তিন জনে কি মার মন হইতে আমার দুঃখ দূর করিতে পার নাই?" হা ভদ্রে! তুমি যে বালিকা, এখনও মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পাও নাই। তিন জনে কেন, শত জনেও মায়ের একজনের দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ

নহে। যাহাহউক, এই দুহিতৃরত্ন আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা শৈশব-সহচরী স্বীয় ভগিনীকে লিখিতেন। সেই সকল কথামৃত হইতে সার পদার্থ আদরটুকু গ্রহণ করিলে, সেই বালিকার লেখণীকেও চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি পিতার প্রতি সম্ভাবে চালিত হইয়া অপর এক পত্রে লিখিযাছিলেন; "স্বর্ণ! তুমি বাবার উপাসনার আসন পাতিয়া দেও কি না জানিতে চাই। আর বাবার আনন্দ কুটীরের চারিদিকে কি কি ফুল ফুটিয়াছে, আমাকে লিখিয়া জানাইও।" এই স্থলে বুঝিতে হইবে, তিনি এই আসনের মূল্য অবশ্য ভালরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। আর সেই পুষ্প-শোভিত কুটীরকেও নিশ্চয়ই অন্তরের সহিত সমাদর করিতেন।

এই সময়ে মুক্তকেশী কিছুদিন পুঁঠিয়ায় সুস্থশরীরে ও প্রফুল্ল-মনে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীয় চিঠি পত্রে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি তখন আনন্দ সহকারে পতিসেবা করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তৎসহবাসে অত্যন্ত আপ্যাযিতা হইয়াছিলেন। এই সময় শরৎ বাবুও সেই সুযোগ্যা দেবোপমা সহধর্ম্মিণীকে সম্মান ও সমাদর দ্বারা সৎকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, ভোগ-সুখে ইঁহারা দুই জনই তুল্যরূপ বীত স্পৃহ, তথাপি একে অন্যের মনস্তুষ্টিসাধন করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। অবশ্য ধর্ম্ম-সৌসাদৃশ্যে ইহাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, পরপ্রীণন বা পরতোষণই সুগন্ধি ফুলের একটী বিশেষ উত্তমতা।

কিন্তু এবড় দুঃখের কথা যে, শীতঋতু অপগত হইবামাত্রই

আবার জ্বরের উৎপাত আরম্ভ হয়। তখন উভয়ের মনে কিছু ভীতি জন্মিয়াছিল; তাঁহারা দেখিলেন পুঁঠিয়ায় থাকিয়া আর নিষ্কৃতি নাই। শরীরের অভ্যন্তরে এই ভয়ানক কীট বিদ্যমান থাকিলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করাও বিড়ম্বনামাত্র। তখন ভগ্ন মনে ও নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে সেই প্রণয়-বিহঙ্গ পিতাব নিকট পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার প্রস্তাব করেন। তৎকালে চিকিৎসকগণও ঐ ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। পিতা তখন গৌহাটী হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিতের কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান; তৎসঙ্গে ঐ নূতন প্রদেশেই মুক্তকেশীরও যাওয়া স্থিরতর হয়।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

কামরূপ গমন।

পতিপ্রাণা সতী তখন আর কি করেন। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে তৎস্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া জল-বায়ু-পরিবর্ত্তন জন্য পিতৃমাতৃ-সঙ্গে কামরূপ যাওয়াই উচিত মনে করেন। এই সময় আবার ইঁহার ৬ মাসের অন্তরাপত্য ছিল, ঐ শুভ ঘঠনাও এই সময়ে পিতামাতার সঙ্গিনী হইবার এক বিশেষ কারণ। চিঠিপত্র দ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্য অবধারিত হইলে পিতার আদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি ভর্ত্তৃ-সঙ্গে গোয়ালন্দে আসিয়া পিত্রাদি সুহৃৎ-সমাগমের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। তৎপর নিরূপিত সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজ আসিয়া পঁহুছিলে ভক্তি-ভাজন পিতামাতা ও অতি আদরের ভগিনী স্বর্ণ, চারু এবং নিতান্ত স্নেহের পাত্র যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আহা কি অপূর্ব্ব মিলন! কি সুমধুর জ্যোৎস্নাই এই সময়ে এই ক্ষুদ্র পরিবারের উপর ঝরিতেছিল। সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ ও মুখে হাসি। কেহ দেখুক আর না দেখুক, লেখক জানেন তৎ-কালে মুক্তকেশীরও সর্ব্বাঙ্গ কিরূপ পুলকিত হইয়াছিল। তিনি পূজ্য-পাদ জনক-জননীর চরণে ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম করিয়া বার বার সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর প্রণত ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে দেখিয়া যেন কতই আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার মনোভৃঙ্গ যেন সেই সুবাসিত পুষ্প-গুচ্ছে নৃত্য করিয়া কতই আমোদ উপভোগ করিয়াছিল। পরে তিনি সঙ্গে করিয়া যে সুমিষ্ট আম্র ও পুঁঠিয়া হইতে যে উৎকৃষ্ট সন্দেশ আনিয়াছিলেন, তাহা মনের আনন্দে সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। অহো সদাত্মা সকল সদাই পরতুষ্টিতে তৃপ্ত ও পর-পূজনেই আপ্যায়িত! এদিকে পিতা মাতাও বহুদিনের পর অতি আদরের কন্যা ও দয়িতাবৎসল জামাতাকে সন্দর্শন করিয়া পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আর শিশুবর্গের সকল আনন্দ তখন ভোজনেতেই পর্য্যবসিত হইল। হায় এরূপ প্রেমের খেলা ও আনন্দের হাট মনে করিতেও কত সুখ হয়। কিন্তু এবড় বিচিত্র, বিধাতার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই; এই আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দের একটী দৃশ্য ছিল, যাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া আইসে। ক্ষণকাল পর মুক্তকেশীর অন্যতম স্নেহকারী মৃতপত্নীক ঠাকুর দাদা গৌহাটীস্কুলের হেড্‌মাষ্টার অভয় বাবু ধীরে ধীরে সাশ্রু-মুখে ও নীরবে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেই অশ্রু ও সেই স্তম্ভন প্রমত্ত উল্লাসকে তিরস্কার করে, এবং সেই গম্ভীর মুখাকৃতিতে দর্শকের মুখের বিস্ফুরিত হাসিও লজ্জিত হইয়া আত্ম-সম্বরণ করে। এই মহাত্মার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী মুক্তকেশীকে বড়ই আদর করিতেন। এমন কি, সেই স্নেহ ও সেই অত্যাদরের আকর্ষণেই মৃত্যুর পরেও মুক্তকেশী সেই দেবীকে স্বপ্নযোগে মধ্যে মধ্যে দর্শন করিতেন। সেই পূর্ব্বস্মৃতি ও যুগান্তর-সঞ্চিত বিদ্যুৎই বোধ হয় এই ঘনতম তমো-

বাঁশির সঞ্চার করিয়াছিল। এইখানে যদিও শরৎ বাবুর যত্নে আহারাদির কথঞ্চিৎ পারিপাট্য হইয়াছিল, কিন্তু ইতি মধ্যে ঐ মহাপুরুষের মুখ আর প্রসন্ন দেখা গেল না। এস্থলে সংসারের লোক বলিতে পারেন, একটী মৃত পত্নীর জন্য আবার এত কান্না ও এত বিষণ্ণতা কেন? আহা! তাঁহারা জানেন না যে, ঐ গভীর খনিতে কি অমূল্য নিধি নিহিত আছে। একবার সকলেরই মনে ভাবা উচিত, যে উদ্দীপনায় একদিন যোগীশ্বর ভবানীপতিকেও ক্ষোভিত হইতে ও সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে হইয়াছিল, সেই পুরাণ-বর্ণিত প্রেমের মূল সকলেরই অন্তরে সঞ্চিত আছে। প্রেমিকের প্রথম বিষণ্ণতা, তৎপরে স্তম্ভন, ইহারও অভ্যন্তরে প্রকৃত বৈদ্যুতিক ব্যাপার, সেই জীবন্ত তাড়িতের স্ফুরণেই দেবদেবের নৃত্য হইয়াছিল। বাস্তবিক মহৎদিগের হাসি কান্না সকলই গভীর অর্থব্যঞ্জক ও ভাবময়।

এই রাত্রিতে জাহাজেই সকলের শয়নের স্থান হইয়াছিল। পিতামাতা, ভাইভগিনী ও স্বীয় জীবন-সহচর স্বামীসহ অতি সুখেই দেবী সেই রাত্রি আসামীয় জাহাজে যাপন করিয়াছিলেন। তৎপর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্যের পর পরস্পরের বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং বেলা ৮টার সময়ে আসামীয় জাহাজ তট-সংলগ্ন সিঁড়ি গ্রহণ করিয়া নদীবক্ষে ভাসিল। এদিকে শরৎ বাবুও স্বীয় সোদরোপম সহচর বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মিশ্রকে সঙ্গে লইয়া নদীতটে দাঁড়াইলেন। জাহাজ পুরাতন গোয়ালন্দ হইয়া অল্প সময়-মধ্যে দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। এখন মুক্ত-

কেশী প্রসন্না কি বিষণ্ণা, তাহা অবশ্য অন্য কাহারও বলিবার অধিকার নাই, যেহেতু তাঁহার স্বভাব-সুন্দর গাম্ভীর্য্য কিছুতেই বিচলিত বা রূপান্তরিত হইতে জানিত না।

জাহাজ প্রথম দিন সেবাজগঞ্জে এবং তৎপর দিবস ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়ার মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া তৃতীয় দিবস রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আরোহীদিগকে গোয়ালপাড়ার পর্ব্বতমালার শোভা সন্দর্শন করাইতে করাইতে লইয়া চলিল। অতঃপর জাহাজ উত্তরোত্তর প্রতিকূল স্রোত ঠেলিয়া যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই যেন নূতন নূতন দেবাধিষ্ঠিত রাজ্যের শোভা দেখাইবে বলিয়া আরোহীদিগকে আশা দিতে লাগিল। বিশেষতঃ অভিনব আরোহীর পক্ষে সেই দৃশ্য বড়ই প্রীতিপ্রদ। তখন বাস্তবিকই যেন বোধ হয়, পোত নরলোক ছাড়াইয়া উত্তরোত্তর কোন উন্নততর স্বর্গাধিকারে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত দিন অতীত করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময়ে জাহাজ গৌহাটীতে যাইয়া পঁহুছিল। এই সময় গৌহাটীর নদীতট বড়ই সুন্দর। বিশেষতঃ রজনীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া জাহাজ ঘাটের আলোকমালা বড়ই সুদৃশ্য দেখায়। তৎপর জাহাজ তট-সংলগ্ন হইলে মুক্তকেশী পিত্রাদি সুহৃদ্‌গণের সহিত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। গৌহাটী যদিও পুরাতন ও বিখ্যাত নগরী, তথাপি আগন্তুকদিগের বাসোপযুক্ত সুবিধা-জনক স্থান প্রায়ই মিলে না। আপাততঃ ইঁহারা থানার অধীন একটী পুরাতন বাটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সাহায্যেই ইঁহারা সর্ব্বথা নিরাপদে বাস করিতে পারিয়া

ছিলেন। স্বসম্পর্কিত বলিয়াই হউক, অথবা স্বীয় স্বভাব-সুন্দর দয়ালুতা গুণেই হউক, এই পরিবারের উপর ইনি সততই প্রসন্ন।

এইস্থানে কয়েকদিন অবস্থানের পরই মুক্তকেশীর শরীর হইতে জ্বর অপগত হয়। তাহার পর তিনি একটুকু অবকাশ পাইয়া শ্রীহট্ট সম্মিলনীর নির্দ্দিষ্ট সপ্তম বার্ষিকশ্রেণীর পরীক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহাতে অতি গৌরবের সহিতই উত্তীর্ণা হইয়া রচনার পুরস্কার, হস্তলিপির পুরস্কার ও সেই শ্রেণীর নির্দ্ধারিত বৃত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। এই পরীক্ষায় বৃত্তি ও পুরস্কারে সর্ব্ব-শুদ্ধ তিনি ৪২৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদুষীর এই সদ্‌গুণ-লব্ধ প্রশংসা ও পুরস্কার তাঁহার গুণবান্ স্বামীর চিত্তে অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহাহউক, ইহার পর কিছু-দিন (শ্রাবণ ভাদ্র দুইমাস) ভট্টিকাব্য দুই সর্গ ও মুগ্ধবোধের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা অতি ধীরতার সহিত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ এই সময়ে অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থা হন নাই।

তৎপর আশ্বিনমাসে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে তিনি একটী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে ধাত্রীর অনবধানতা-দোষে ঐ সন্তানটী নষ্ট হইয়া যায়। এই ঘটনার সময়ে সুধীর ও সুপ্রেমিক শরচ্চন্দ্র চৌধুরীও প্রাণতুল্যা পত্নীকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কার্য্যবশতঃ তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কয়েক দিবস পর মুক্তকেশীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যস্থানে

চলিয়া যান। তৎপর মুক্তকেশীও স্বল্পদিন মধ্যেই ঈশ্বরানুগ্রহে আরোগ্যলাভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরের সমস্ত উদ্বেগই বিদূরিত হয়। পিতামাতার অতি আদরের চাঁদ অচিরেই রাহু-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আবার শোভমান হইল। অতঃপর ইনি জীবনের অতি উচ্চ আকাশ আরোহণ করিয়া চলিলেন।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা।

এই সময় মুক্তকেশীর জ্ঞান ও ধর্ম্মস্পৃহা বড়ই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে তিনি এক দিবস পিতার নিকট রীতিমত ধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করেন। কি কারণে বলা যায় না, এই হইতে তাঁহার হৃদয় যেন অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠে। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া ভক্তিভাবে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। ইনি বয়সে নবীনা হইলেও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য-বলে সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীনার ন্যায় সম্মানার্হা ছিলেন। দেখা গিয়াছে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইহাঁর বড়ই আনন্দ হইত। ইনি খোরসেদপুর অবস্থান কালে পিতার নিকটে এতদ্বিষয়ে যে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"দেব। রামকুমার বাবু, মদন বাবু এবং আমার ভালই উমাচরণ বাবু কেমন আছেন? তাঁহারা এখন পাঠ শুনিতে আইসেন কিনা জানিতে চাই। আপনাদের আসন পাতিয়া এবং ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আপনারা সকলে যখন এক মনে, একতানে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, তখন মনে কত যে শান্তি হইত বলিতে পারি না। সন্ধ্যাকাল হইলেই এখন আমার মনে হয়, আপনারা বুঝি পাঠাদি করিতেছেন।"

ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, মুক্তকেশীর রুচি

কিরূপ বিশুদ্ধ ও অন্তরের স্বাভাবিক আকর্ষণ কোন্ দিকে ছিল। সুগন্ধা মালতীর ঈষদ্বিকাশনেই অপূর্ব্ব সৌরভ উদ্গত হয়; স্ফুটনোন্মুখ শতদলের অস্ফুট হাসিতেই নলিনীর অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। সেই সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্য ভাবুকের আত্মাতেই অধিক আনন্দপ্রদ সন্দেহ নাই। তৎপর পুঁঠিয়ায় অবস্থান-কালেও তিনি পিতার নিকটে যে একবার হৃদয়ের অত্যুচ্চ কামনা অভিব্যক্ত করেন, সেই লিপিরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

"দেব! আমি এই পবিত্র কুলে জন্ম ধারণ করিয়া কি করিলে সাধারণ হইতে পৃথগ্‌ভূত জীবন গঠন করিতে পারিব, তাহা আমি আপনার নিকট উপদেশচ্ছলে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আপনি আমাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমি যেন ঠিক সেইরূপই হই। আমিও সতত ঈশ্বরের নিকটে ইহাই প্রার্থনা করিব।"

হায়! ইহাকি মনের একটী সামান্য উচ্ছাস ও সামান্য আকাঙ্ক্ষা যে, "আমি কি করিলে সাধারণ হইতে পৃথগ্‌ভূত জীবন লাভ করিতে পারিব।" আর "আমি আপনার নিকট উপদেশচ্ছলে শুনিতে ইচ্ছা করি।" ইহাই কি একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পক্ষে সামান্য বিষয়। যাহা হউক, এ স্থলে ইহাই অতি আহ্লাদের বিষয় যে, ভগবান অচিরেই এই সাধ্বীসতী বালিকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিকই অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটী বিশুদ্ধ জীবন প্রাপ্ত হন। এতদ্ভি-

যে অতি সদাত্মা মুক্তকেশী-পতি বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরির নিম্ন লিখিত চিঠি খানাই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি মুক্তকেশীর গৌহাটী অবস্থানকালে তাঁহার পিতা মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;—

"দেব! গতকল্য মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ এবং অদ্য আপনার অমৃতবর্ষী পত্র খানা পাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিলাম। আমার উদ্দাম আত্মা আপনার দেব-পরিবার-সংসৃষ্ট হইয়া ধন্য হইয়াছে। যে হৃদয় মরুভূমি ছিল, আজ তাহাতে স্বচ্ছ-সলিলা প্রবাহিনী প্রবাহিত হইতেছে। আমি আজ জগৎকে অমিশ্র-সুখ-পূর্ণ দেখিতেছি। যিনি এইরূপ অতুল সুখের বিধান কর্ত্তা, বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার প্রতি ভক্তিতে অবনত এবং প্রেমেতে বিগলিত হয়। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সর্ব্বাংশে আপনার সুশীলা দেবোপমা মুক্তকেশীর উপযুক্ত হইতে পারি। আপনাদের লোকোত্তর স্নেহ-যত্নের ছায়ায় থাকিয়া তাঁহার চরিত্রের অতলস্পর্শ পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল স্বর্গীয় বৃত্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, আমি যেন চিরদিন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকি। যেন আমাদের পবিত্র বন্ধন দৃঢ় হইতে থাকে, আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়িতে থাকে।"

সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, ঈশ্বর অচিরেই এই সদাত্মার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তকেশীর যে সকল স্বর্গীয় বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে চিরদিন মুগ্ধ হইতে, পবিত্র দাম্পত্য বন্ধন দৃঢ় হইতে ও আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়িতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অতি খাঁটিরূপে এই তিনটী প্রার্থনাই

পূর্ণ করিলেন। যথাসময়ে দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিকই মুক্তকেশীর স্বর্গীয় প্রেমে শরৎবাবু মুগ্ধ। দাম্পত্য-বন্ধন সুদৃঢ় ও আধ্যাত্মিক সম্পদে মুক্তকেশী সিদ্ধকাম, এবং শরৎবাবু সর্ব্বতোভাবে সেই পুরদ্বারে উন্নীত ও প্রবেশোন্মুখ। ইহা সৌভাগ্য না দৌর্ভাগ্য, স্বর্গে উন্নয়ন না নরকে নিমজ্জন, একথা আমি স্বার্থপর সংসারকে বুঝাইতে চাহিনা। এইস্থলে আমি কেবল ইহাই বলিব যে, হৃদয়োত্থিত আকাঙ্ক্ষার উপর ভগবান্ কিরূপে ফলদান বা প্রতিক্রিয়া করেন, তাহাই বিশ্বাসীর প্রতীক্ষণীয়।

কিছুদিন পর মুক্তকেশীর শরীর ও মন কথঞ্চিত সুস্থ হইলে তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের নিয়মানুসারে পুরাণ বিষয়ে একটী পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করায় তিনি অতি আহ্লাদ ও আগ্রহের সহিতই তদ্বিষয়ের পড়াশুনায় প্রবৃত্তা হন, এবং সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর অন্যান্য পুরাণ হস্তগত হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি বার শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণ, এবং সোম, বুধ ও শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও চণ্ডী। শনিবার অনুবাদ, সংস্কৃত রচনা ও কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষা। এতদ্ভিন্ন পিতার অবকাশ-কালে কোন কোন দিবস রাত্রিতে পিতার নিকট বসিয়া মৌখিক সংস্কৃত আলাপ অভ্যাস করিতেন। এই সকল বিষয়ে মুক্তকেশীর একান্ত মনোযোগ ও নিরতিশয় যত্ন দেখিয়া পিতা বড়ই আশ্বস্ত হন, এবং পিতা পুত্রী উভয়েই নিতান্ত মনোযোগের সহিত অভীষ্ট সাধনে যত্ন করিতে

থাকেন। এই সময়ে স্বামীও সর্ব্বদা চিঠিপত্র দ্বারা জ্ঞান-পথের যাত্রী দেবীকে উৎসাহিত করিতে ক্রটি করেন নাই। বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষে জল-সিঞ্চন অবশ্যই তাহার বিশেষ পুষ্টিসাধক সন্দেহ নাই। ইনি স্বীয় জীবন-সহচরের প্রবর্ত্তনায় ক্রমেই অধিকতর উৎসাহের সহিত গন্তব্য পথে ধাবিতা হয়েন।

সদাত্মা বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী স্বীয় প্রাণতুল্যা সহধর্ম্মিণীর উচ্চ শিক্ষার জন্য কতদূর আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহা তাঁহার এই পত্রাংশ পাঠ করিলেই পাঠক পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। তিনি এক পত্রে লিখেন, "এখন আমার প্রধান ব্রত, শ্রীমতীর শিক্ষা-সমাপ্তি। আপনি এযাবৎ তাঁহার শিক্ষার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, আমার দোষে আপনার সে যত্ন বিফল না হয়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালীর বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিতা হইয়া গৃহিণী ও সন্তানবতী হয়, এজন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আধুনিক সংস্কারকেরা এই যুক্তি দেখাইয়া কন্যাদিগকে ২০। ২২ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতেছেন। আমার ইচ্ছা, হিন্দুসমাজের প্রচলিত নিয়মে বিবাহ সমপন্ন হইলেও ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, অথচ সে শিক্ষা রমণী-জীবনের একান্ত উপযোগিণী, এইসত্যটী শ্রীমতীর জীবনে সপ্রমাণ করা। আমার বিশ্বাস, যদি আমরা কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে এই পবিত্র পথে অগ্রসর করিতে পারি, তবে আমাদের এ আশা অপূর্ণ থাকিবে না।

আপনি লিখিয়াছেন "মধ্যে মধ্যে স্নেহতরুর ছায়ায় বসিয়া উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করা উচিত।" কিন্তু আমি বিবে-

চনা করি সে ছায়া সর্ব্বদা আমার উপরে প্রসারিত রহিয়াছে এবং অনন্ত জীবন থাকিবে। আপনি নিজেই বলিয়াছেন, আমরা পতিপত্নী যখন একাসনে বসিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিব, তখন আপনি পরলোকে থাকিলেও তাহাতে যোগদান করিবেন। এমন আশ্বাস-বাক্যে কখনই নৈরাশ্যের ছায়া পড়িতে পারে না। আমার মতে এজীবন অনন্তজীবনের অংশ মাত্র। পার্থিব সম্বন্ধ পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে থাকিবে। আমি যেখানেই থাকি, আপনাদের স্নেহ অতি আশ্চর্য্য ভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করে; স্নেহের এক এক খানি পত্র, এক একটী সম্বোধন যেন স্বর্গের অমৃত-ধারা হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়।"

এই পত্রখানির ভাবুকতা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেবীর জ্ঞান-শিক্ষা বা শাস্ত্রাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উপজাত এই সদাত্মার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চধারণা ও অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতা এই চরিতামৃতের সঙ্গে মিশিয়া থাকুক। এই সুন্দর ভাবময় কথাগুলি নষ্ট হইতে না দিয়া চিরদিন জীবিত রাখা উচিত। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর শিক্ষার ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়া আপনাকে তৎসঙ্গ হইতে নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক দূরে রাখিতেই চেষ্টা করিতেন। এইরূপ আত্মনিপীড়ন মহজ্জীবনেরই লক্ষণ বলিতে হইবে।

এই দিকে মুক্তকেশীর ভাবও অতি উচ্চ আদর্শে উপচিত হইতেছিল; তিনি শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিয়া জন-সমাজে প্রতিপত্তি বা উচ্চ যশের আকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন না। তিনি শাস্ত্রীয় জ্ঞানালোক সংগ্রহ করিয়া প্রিয় সহচরের সহিত পবিত্র ধর্ম্মরাজ্যে

প্রবেশ করিবেন, ইহাই তাঁহার গুহ্য অভিপ্রায় ছিল। তিনি প্রাচীন যোগাচার ও তপশ্চর্য্যার বড় পক্ষপাতিনী ছিলেন। প্রাচীনা তাপসী ও ঋষিপত্নীদিগের নামে ইঁহার বড় আনন্দ হইত। পুণ্যশীলা জ্ঞানার্থিনী সতীর এইরূপ রুচি ও তৎসাধনে ঐকান্তিক আগ্রহ অবগত হইয়াই পিতা শাস্ত্রপাঠে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করেন; এবং দুই বৎসর কাল পড়িয়া ১২৯৫ সালের ফাল্গুণ মাসে পরীক্ষা দিবেন, ইহা অবধারিত হয়।

কিছুদিন পর শরৎ বাবু এতদ্বিষয় কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়া জ্ঞাপন করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় আহ্লাদিত হইয়া নিম্নলিখিত চিঠিদ্বারা উত্তর প্রদান করেন।

"সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়ের পত্র পাইলাম। আপনার সহধর্ম্মিনী পুরাণ-পরীক্ষা দিতে উদ্যতা হইয়াছেন, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আর্য্যমহিলাগণের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষা পাশ্চাত্যশিক্ষারও অনুযায়িনী নহে। তবে পরীক্ষার নিয়ম কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তিনি লজ্জাশীলা, সুতরাং আমি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারি। অর্থাৎ তিনি আমার বাড়ীতে আমার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য স্ত্রীগার্ড নিযুক্ত করা যাইবে। ইহা আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়াই লিখিলাম। ইতি— বশম্বদ—

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।"

এই চিঠিসহ শরৎ বাবুরও উৎসাহপূর্ণ এক খানা লিপি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তকেশী আরও দ্বিগুণতর উৎসাহ ও যত্নের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্তা হয়েন। মাঘ মাস হইতে ইনি নিয়মিতরূপে প্রতি দিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শুচিপবিত্রভাবে পিতার ধর্ম্ম-কুটীরে উপবেশন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। তৎপর ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণাম করিতেন; এই সময়ে ইহাঁর অন্যান্য ভ্রাতাভগিনীরাও তাঁহার সেই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক পিতৃ-মাতৃ-চবণে মস্তক আনত করিয়া আনন্দ বোধ করিত। তাহার পর মুক্তকেশী পাঠ্যপুস্তক সকল লইয়া অধ্যয়নার্থ পিতৃ-সন্নিধানে সেই কুটীরেতেই উপবেশন করিতেন। ইহাঁর এই দৃশ্যটি আরো সুন্দর ও অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং নিরবচ্ছিন্ন দেবভাবেরই প্রবর্ত্তক। ইনি যখন পবিত্র ভক্তি-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাতে রাখিয়া গম্ভীরভাবে উপবেশন করিতেন, ও তৃষিত হইয়া পিতার মুখের ব্যাখ্যান শুনিতেন, তখন যেন একটী অমানুষী মূর্ত্তি বলিয়াই প্রতীতি হইত। তিনি পূর্ব্বাহ্ন ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া তৎপর পিতার ভোজনের স্থান পরিষ্কার ও তদুপরি আসনাদি বিন্যাস করিয়া দিতেন। এবং তদর্থ তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া রাখাও ইহাঁরই একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। এই সকল কার্য্য অবশ্য সকলেই করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাবের সহিত করিলেই সে সকল অপূর্ব্ব হয়। পরিচর্য্যার ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি সামান্য কার্য্যেই মহৎ পুণ্য হইতে পারে। তৎপর স্নান ভোজন করিয়া স্বল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পুস্তক লইয়া বসিতেন। তাহার পর রাত্রিতেও প্রায়

১টা ২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া অধীত পাঠ অভ্যাস করিতেন। দেখা গিয়াছে, এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেও যেন তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হইত না। এইরূপে অতিশয় শ্রম ও তেজের সহিত তিনি নিয়ত পড়া শুনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই অনন্ত-নিহিত আশা, উদ্যম, ও প্রাণগত যত্ন দেখিলে, সময়ে যে ইনি একজন অসাধারণ লোক হইবেন, তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইত।

কেবল বিদ্যাতে নয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ভগবান্ যেন ইহাঁর উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জনক ও ভর্ত্তা দুই জনেই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের চির অনুকূল ও নিত্য-সহায় ছিলেন। জননী যদিও প্রাচীন ধর্ম্মমতেরই পক্ষপাতিনী, কিন্তু তিনিও বিরোধিনী নহেন। কাযেই মুক্তকেশীর ধর্ম্মমত স্বাধীন ও স্বগত-মহিমাতেই পরিপুষ্ট হইতেছিল। অপিচ তিনি যদিও একেশ্বরের উপাসনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম হিন্দুবিধানের বাহিরে মনে করিতেন না, তিনি হিন্দু-প্রবর্ত্তিত যোগ ও তপস্যাই ধর্ম্মের উচ্চ সোপান মনে করিতেন, এবং আপনাকে তৎসাধনের উপযুক্ত করিবার জন্যই নিয়ত যত্ন করিতেন।

দীনদুঃখীর প্রতি ইহাঁর বড় ভালবাসা ছিল, কখনও কোন দুঃখিনী স্ত্রীলোক বাড়ীতে আসিলে, নিকটে বসাইয়া তাহাদের দুঃখের বার্ত্তা কাণ পাতিয়া শুনিতেন। অনেক দিন তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিবার সাধ্য নাই বলিয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণা হইতেন। আহা! পরের দুঃখ ও পরের কষ্ট আপনার হৃদয়ে ধারণ করা সাধুপ্রকৃতিরই লক্ষণ; অনেক দিন, কেহ যেন না

দেখে এমন ভাবে দুঃখীদিগকে কোন একখানা কাপড় অথবা কিছু পয়সা দিতেন। লোক দেখাইয়া কার্য্য করিতে যেন তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইত। আহা! ইহাই দেবীর দেব-চরিত্র!

১২৯৪ সালের মাঘ মাসে গৌহাটীতে পিতার নূতন গৃহে এক দিবস মহিলাদের ধর্ম্মোৎসব হয়, তাহা মুক্তকেশীরই যত্নে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাতে ঈশ্বরোপাসনার পর অবরোধে (ঝাঁপের অন্তরালে) বসিয়া নারী-জাতি-সম্বন্ধে ইনি একটী স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহা শুনিয়া উপাসক-মণ্ডলী বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। * তৎপর ইঁহারই যত্নে একটী বিধবা দেবীকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সফরিকলা ও হরীতকী প্রদান ও অপর একটী সধবাকে দধিকলা, তাম্বুল ও সচন্দন পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। তৎপর মুক্তকেশী আবার স্বহস্তে নিরামিষ বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ও লুচি-পায়স রন্ধন করিয়া একটী গরীব লোকের সেবা দেন ও প্রাতের উপাসনায় উপস্থিত মহিলাদিগকে ভোজন করান।

ইহার কিছুদিন পর মুক্তকেশী পিতৃমাতৃসঙ্গে একবার বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করিতে যান। ঐ আশ্রম গৌহাটী হইতে প্রায় ৯ মাইল অন্তর। শকট লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেই তিনি স্বীয় ভগিনী স্বর্ণপ্রভাকে সঙ্গে করিয়া মনের আনন্দে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতে লাগিলেন, এবং পিতার

* পাঠক উক্ত প্রবন্ধটী ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠের নব-জীবনে দেখিতে পাইবেন।

নির্দ্দেশ-ক্রমে মালা গ্রন্থন করিবার জন্য সেই অরণ্য-পথের উভয় পার্শ্ব হইতে সকলে শ্বেতপুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কোথাও একটী ফুলের গাছ দেখিলে অমনি সকল ভ্রাতা ভগিনী হাসিতে হাসিতে তদভিমুখে ধাবিত হয়েন, এবং কে অধিক পুষ্প চয়ন করিতে পারেন, তাহারই জন্য ব্যগ্র হন। অরণ্য এমনই নির্ব্বিকার স্থান যে, অতি সুশীলা ও গম্ভীরপ্রকৃতি মুক্তকেশীকেও সেই নির্দ্দোষ-আমোদ প্রদ বাল-চাঞ্চল্যে শোভমানা বোধ হইয়াছিল। এইখানে এই ফুলক্রীড়া পিতামাতার সম্মুখে হইয়াছিল বলিয়াই আরও সমধিক সুন্দর ও একান্ত নির্দ্দোষ বোধ হইতেছে। তাহার পর আশ্রম যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আশ্রম-সন্নিহিত পথের উভয় পার্শ্বস্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট ও অত্যুচ্চ বনরাজি সন্দর্শন করিয়া মুক্তকেশীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি অতি প্রফুল্লচিত্তে সেই শান্তিপূর্ণ ছায়াপথে সুহৃদ্‌গণসঙ্গে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রম-পাদ-ধৌতকারিনী মনোজ্ঞ ঝরণাটী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আরও আনন্দ বাড়িল। অতঃপর সকলে সেই পুণ্যসলিলে স্নান ও ধৌতবসন পরিধান করিয়া ঝরণার পার্শ্বস্থ শিলাতলে একটী বৃক্ষছায়ায় বসিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করেন। তৎপর পিতার ধ্যানযোগ নামে একটী অধ্যায় পাঠ ও তদন্তে নাম কীর্ত্তন হয়। ইহার পর মুক্তকেশী ভূমিষ্ঠভাবে পিতামাতা ও একান্ত স্নেহকারী সুহৃদ্ অভয় বাবুর পাদস্পর্শ করিয়া একে একে সকলকে প্রণাম করেন। এইরূপে বশিষ্ঠকুণ্ডে স্নান ও আত্মকার্য্য সমাপন করিয়া সকলে মন্দিরে যাইয়া বশিষ্ঠদেবের যোগাসন ও তৎপিতা

ব্রহ্মার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন। পরে সত্বর অনুষ্ঠানে সঘৃত ও সদুগ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া পুনশ্চ প্রবাহিত ঝরণা, মন্দির ও তৎসন্নিহিত একটী পর্ব্বত-শিখর দর্শন করিয়া প্রমোদিতমনে সকলে আবার বৃক্ষরাজী-শোভিত আশ্রম-পথ দিয়া বহির্গত হইলেন, এবং শকটারোহণে ধীরে ধীরে চলিয়া সেই পুণ্যতীর্থ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে আলাপ করিতে করিতে স্বীয় আবাসে গৌহাটীতে আসিয়া পহুঁছিলেন।

আসামের মধ্যে কামরূপ তীর্থের জন্যই প্রসিদ্ধ। সেই সকল পুণ্যতীর্থ কবে কিরূপে সংগঠিত হইল, তাহা যথার্থরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। সর্ব্বত্রই পাণ্ডাদিগের প্রমুখাৎ অনেক অসম্ভব গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, সেই সকল অত্যুক্তি বাদ দিলেও তীর্থ-মহিমার কোন ক্ষতি হয় না। ঐ সকল স্থানের প্রকৃতিই দর্শকের মনে পুণ্য ও পবিত্রতা আনিয়া দেয়। বশিষ্ঠাশ্রমে মাঘ মাসেই বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তদ্দেশবাসীরা মাঘ মাসেই প্রায় তথায় যাইয়া তীর্থ-সুখ উপভোগ করেন।

বশিষ্ঠাশ্রম হইতে আসিয়া মুক্তকেশী আবার স্নেহকারী পিত্রাদি সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে কামাখ্যা-তীর্থে গমন করেন। যাইবার দিন অতি প্রত্যূষে স্নানাদি করিয়া শুচি পবিত্র হইয়া শকটারোহণে সকলে যাত্রা করেন। তৎপর শকট অতি অল্প সময়েই কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন যাত্রীদল প্রফুল্লচিত্তে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রস্তরময়ী সিঁড়ীর অভিমুখী হইলেন। এই পথ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান হইলেও বড় দুরা-

রোহ। সর্ব্বাগ্রে পাণ্ডাঠাকুর, তৎপর চারুপ্রভাকে কোলে করিয়া একজন ভৃত্য ও সুরেন্দ্রনাথ চলিলেন। তাহার পর মুক্তকেশী ও তদ্ভগিনী স্বর্ণপ্রভা, তৎপশ্চাৎ যতীন্দ্রকে কোলে করিয়া মাতাঠাকুরাণী ও সর্ব্বশেষে বসনপ্রিয় হরিভক্ত দেবদূত যোগেন্দ্রনাথকে হস্তে ধারণ করিয়া মুক্তকেশীর পিতা উঠিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর ও ভাবময়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, মন উৎসাহিত ও অঙ্গ পরিষ্কৃত বসনে শোভিত; বোধ হয় যেন ইহাঁরা কোন সুকৃতির ফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। বাস্তবিক এইরূপ সদ্ভাবে চালিত হইলে লোক মর্ত্ত্যে থাকিয়াও দেবশোভা বিস্তার করিতে পারে। ইহাতে আরও সৌন্দর্য্য এই, মুক্তকেশী দেবী আন্তরিক উৎসাহবশতঃ অগ্রে অগ্রে যাইয়াও বারবার ফিরিয়া সন্তান-বৎসল জনক-জননীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালের ভাবমাত্র পরিগ্রহ করিলে বোধ হয়, যেন ইনিই এই পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা এই দলের নেত্রী ছিলেন। বাস্তবিক তৎসময়ের সেই ভাবটী চিত্রিত করিয়া দেখাইলে লোক তাহাই সিদ্ধান্ত করিবে। ইনি অধিক বেশভূষা ভাল বাসিতেন না, অথবা বিনা অলঙ্কারেই তাঁহার গায়ে শোভা ধরিত না। পরিধেয় একখানা অতি পরিষ্কৃত মোটা পাইড়দার ধুতি ও একটী বনাতের পিরাণ মাত্র গাত্রাচ্ছাদন এবং তদুপরি সুদীর্ঘ কেশরাজী গুচ্ছাকারে নিবদ্ধ হইয়া পিঠের উপরে ঝোলান ছিল; ইহাতেই তাঁহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাইত। সেই সৌন্দর্য্য ও সেই দেবকান্তি কাহারো কোন ক্ষতিকর নহে। তাঁহার শরীরের স্বভাব-সুন্দর লাবণ্য, স্বভাবের গাম্ভীর্য্য, মুখের

প্রসন্নতা, সলজ্জ চক্ষের পত্র ও চিত্তের অচঞ্চল আনন্দ যুগপৎ অনুভাবিত হইলে দর্শকমাত্রেরই মনে সম্ভ্রম না আসিয়া পারে না। ইহাঁর অঙ্গ নাতিস্থূল ও সুগঠিত ছিল। ইনি উত্তম গৌর-বর্ণা ছিলেন। আর লিখক জানেন, ইহাঁর মনের বর্ণ শরীরের বর্ণ হইতেও ফরসা ছিল। যাহা হউক যাত্রী-দল ক্রমে ক্রমে সেই গম্যপথে উত্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথ এতই দুরারোহ যে, মধ্যে দুইবার তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। শেষে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়াও ক্লান্তিবশতঃ একটী তরু-ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রামের পর বীতশ্রম হইয়া সকলে পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় অগ্রে পাণ্ডা মহাশয়ের ভবন ও তৎপর ভুবনে-শ্বরীর মন্দির দর্শন করিতে যান। সেই মন্দির অতি উচ্চস্থানে সন্নিবেশিত, দেখিলে দর্শকমাত্রেরই মনে আনন্দ হয়। তথায় যাইয়া দাঁড়াইলে একদিকে আসামীয় পর্ব্বতশ্রেণী ও অপরদিকে ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যপ্রবাহ নবাগন্তুক দর্শকের মনে বড়ই আনন্দ উৎ-পাদন করে। এই স্থানে একটী রামায়ত বহুদিন যাবৎ অবস্থিত আছেন; দেখিলে ইহাঁকে বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন বলি-য়াই প্রতীতি হয়। তীর্থস্থানে এইরূপ সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্ম-নিরত মহাপুরুষের অবস্থান অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

ইহার পর সকলে অন্যান্য দেবালয় দেখিয়া কামাখ্যা পীঠ দর্শন করিতে যান। কামাখ্যা দেবীর মন্দির পাণ্ডা মহাশয় দিগের নির্দ্দেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত। এই বাক্যে প্রত্যয় না করিলেও ইহার খোদিত প্রস্তর ও গঠন সৌকার্য্য সন্দর্শন করিলে প্রাচীন শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

মন্দিরের অভ্যন্তর গম্ভীর অন্ধকারময়, দীপালোক লইয়া পীঠ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। যাত্রীদল একে একে সমুদয় দেখিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলে মুক্তকেশী একটী কুমারীকে একখানা বস্ত্র, একছড়া পুষ্পমাল্য ও সদক্ষিণ কিঞ্চিৎ ভোজ্য প্রদান করিলেন। তৎপর ঐরূপ উপকরণে একটী সধবা দেবীকেও পরিতুষ্ট করেন। আর মুক্তকেশীর মাতাঠাকুরাণী কামাখ্যা দেবীর পূজা দিয়া তদীয় স্বর্গগত জনক জননীর তৃপ্ত্যর্থ অন্ন জল তাম্বুল ও বস্ত্র দান করেন। তাহার পর কয়েকটী ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। পিতা সকলের পৃষ্টপোষক মাত্র, সকলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সকলের রুচি অনুসারে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অভিমুখ করিয়া দেওয়াই ইহাঁর কার্য্য। এইরূপ তীর্থকার্য্য সমাপন হইলে আহারের পর আবার সকলে পর্ব্বততলে অবতরণ করিয়া শকটারোহণে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সকল তীর্থকার্য্যের অধিকাংশ ব্যয়ই মুক্তকেশী দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর স্বভাব এমনই সাধু যে, ইনি যে একটী পয়সা প্রদান করিয়াছেন, একথাটিও কাহার বুঝিবার সাধ্য নাই। এতদ্বিষয়ে ইহাঁরা পতিপত্নী উভয়ই এক আদর্শের লোক। কোন বিষয়ই উচ্চবাচ্য নাই, কার্য্যারম্ভে বা কার্য্যান্তে ঢাক ঢোল বাজাইয়া লোক জানান ইহাঁদের বিধানবিরুদ্ধ। আহা! বিধাতা যেন একই উপকরণে উভয়েরই মন প্রাণ গড়াইয়াছিলেন! সাধুশীলা দেবী ইহার পর আবার পড়া শুনাতে মনোযোগ প্রদান করিলেন। এইক্ষণে কেবল দিবারাত্রি পুস্তক লইয়াই কার্য্য। দেখা গিয়াছে, কোন একটী কার্য্যোপ-

লক্ষে দুই এক দিবস পড়াশুনার ক্ষতি হইলে আরও দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত তিনি তাহাতে প্রবৃত্তা হইতেন। বাস্তবিক এইরূপ লোকই জীবনের উচ্চসোপান আরোহণ করিয়া স্বর্গবাসে যাইবার উপযুক্ত।

সাধু সজ্জনদিগের প্রতি ইহাঁর বড়ই আন্তরিক সমাদর ছিল। একবার গৌহাটীতে প্রচারক বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় আগমন করেন। তাহাতে একদিন তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বহস্তে নিরামিষ রন্ধন করিয়া সেই সাধু পুরুষের সেবা দিয়াছিলেন, এবং পিতার ধর্ম্মকুটীরেতে সেই সদাত্মার মুখে ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও সদালাপ শুনিয়া পিতার নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন। তৎপর সেন মহাশয়ও লোকমুখে পণ্ডিত-দুহিতার বহুল সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া স্বরচিত দুইখানা ধর্ম্মপুস্তক তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। আর একদিন শ্রীহট্টনিবাসী বাবু দীননাথ দাস বি, এ, মুক্তকেশীর সদ্‌গুণে আপ্যায়িত হইয়া একখানা নীতিগর্ভ ধর্ম্ম-পুস্তক প্রদান করেন। তৎপাঠে দেবীর বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কেহ তাঁহার প্রতি কখনও কোনরূপ সদ্ব্যবহার করিলে তিনি কৃতজ্ঞতায় যেন একেবারে গলিয়া যাইতেন। এইরূপ সজ্জনে ভক্তি ও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্য সাধুতারই লক্ষণ বুঝিতে হইবে; এবং ইহাই ধর্ম্মের উপকরণ ও ঈশ্বরপূজার অতি উপাদেয় সামগ্রী।

কিছুদিন পরে মুক্তকেশীর পিতার কাছাড় স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া স্থিরতর হইলে, তিনি এ বিষয়ে বড় সঙ্কটে পড়েন। গৌহাটী হইতে সকলকে লইয়া ষ্টিমারে কাছাড় যাইতে বহুতর

টাকা পয়সার আবশ্যক। পিতার যে স্বল্প আয়, তাহাতে তিনি সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আবার এই অতিরিক্ত খরচ পত্র চালাইতে পারেন, এমন সম্ভব নাই। বিশেষতঃ স্থান পরিবর্ত্তন সময়ে সমস্ত দেনা পাওনা পরিষ্কার করা আবশ্যক। এদিকে স্বামীও আবার উভয়ের পূর্ব্বভুক্ত রোগের চিকিৎসা ও অপর নানা কারণে কথঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত এবং আপাততঃ অর্থকৃচ্ছ্রে পতিত, ইহাও মুক্তকেশী জানেন। অথচ এই সময়ে পিতার সঙ্গ ছাড়া হইলে যে জীবনের সমূহ ক্ষতি, ইহাও প্রাণে সহ্য হয় না। কি করেন, তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্বামীকে লিখিলেন ;—

"হৃদয়েশ্বর! আজ বাবা বলিতেছেন, তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া একা কাছাড় যাইবেন। টাকা পয়সা হাতে কিছুই নাই, লোকের কাছে ধার পাইবারও সম্ভব নাই। অথচ এখন আমাদিগকে লইয়া যাইতে হইলে ১০৭৲ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ পরামর্শ শুনিয়া আমার মন যে কেমন হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব। আমার মন এদিকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে পড়াশুনা কখনই ছাড়িব না। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিবে কি না তাহাই সন্দেহস্থল হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি এ কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানিতে পারিবেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষা দিব, এখন দিতে না পারিলে কেমন লজ্জার কথা। লোকে না জানিলে এত লজ্জার কারণ হইত না। যাহাহউক

এ বিষয়ের সম্পূর্ণভার আমি ঈশ্বরের হাতেই অর্পণ করিলাম। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এ দিকে আমার জ্ঞান-পিপাসু মনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না, আর কিছুদিন বাবার নিকট না থাকিলেও আমার প্রকৃত জ্ঞানলাভের আশা নিতান্তই কম। আমি দেখিলাম কোনরূপে এইক্ষণে কাছাড় যাওয়ার খরচটা যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেও সম্প্রতি চলিতে পারে। আমার চিক্ ও চন্দ্রহারগাছি পাঠাইতেছি, ইহা বিক্রয় করিয়া যে কয়টী টাকা পাওয়া যায়, তাহা বাবার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার মাথার দিব্য, চিক্ ও চন্দ্রহার ফেরত দিবেন না। ইহা বিক্রয় না করিয়া ফেরত দিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অবশ্যই ইহাতে যে আপনার খুব কষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু নাথ! বিপত্তির সময়ে কোন কষ্ট না করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমার আর অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? আপনিইতো আমার অলঙ্কার। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে যে দেব-দুর্ল্লভ স্বামী রত্ন দিয়াছেন, ইহা যেন আমার অনন্ত জীবনের হয়। * * আমি মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, আপনি এই জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি এইগুলি বিক্রয় করিতে আপনার নিকট দিতাম না, কিন্তু এখানে বিক্রয় করিবার কোন সুবিধা পাইলাম না। * * * পিতা মহাশয়ের চিঠি খানাও দেখিলাম, আমার শিক্ষার ব্যাঘাত হইলে তিনিও যে নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা-হউক, আমাদের উভয়ের পত্র পাঠ করিয়া আপনি যাহা ভাল

বিবেচনা করেন, করুণ। মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায় হই। শ্রীচরণের মঙ্গল সংবাদে দাসীকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

আপনার অনন্ত জীবনের দাসী

মুক্ত।"

এই চিঠিখানা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, মুক্তকেশীর জ্ঞান-স্পৃহা কেমন বলবতী ছিল, ও তল্লাভার্থে তাঁহার আন্তরিক কেমন ব্যাকুলতা ছিল। "আমার অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি ? আপনিইত আমার অলঙ্কার।" আহা! এই কথাটী কি সুমিষ্ট। বাস্তবিক অলঙ্কারের প্রতি স্বতঃই ইহাঁর এক তুচ্ছভাব ছিল। তিনি এ বিষয়েও নবীনা রমণীকুলের আদর্শ স্বরূপা ছিলেন। আর "বিপদের সময়ে কোন কষ্ট মনে না করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।" ইহাও কেমন একটী সুধীর লোকের মত উক্তি। হা ধন্য দেবি! কথায় কথায় তোমার দেবচরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন, "এমন সুন্দর আত্মা আর পৃথিবীতে দেখিব না।" আর ইহাও ঠিক কথা যে, তিনি "ষোড়শ বর্ষে নিজের জীবনে এরূপ দেবত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন যে, আরও কিছুদিন থাকিলে অনেককেই হয়তো দেবতা করিতেন।"

দেবী আবার অন্য একপত্রে তাঁহার আত্মদেবতা ও জীবনের সর্ব্বস্বধন স্বামীকে লিখেন, "প্রাণধন! রাত্রিজাগরণে এখন আমার বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। আমি সর্ব্বদাই যে তিন চারিটা পর্য্যন্ত জাগরণ করি, এরূপ [illegible] যেদিন আপনার [illegible]

প্রাণটা একটু অধিক অস্থির হয়, সে দিন অনেকক্ষণ জাগিয়া পড়ি। কারণ আমার মনে হয় যে, পড়াশুনা যত শীঘ্র করিতে পারিব, তত শীঘ্রই আমার প্রাণনাথকে পাইব। যাহা হউক এজন্য আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না। নানা পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বাবা আমাকে জাগিতে দেন না।”

এই চিঠিখানা পাঠ করিলে, তাঁহার উৎকট শ্রমশীলতা, বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ও স্বীয় জীবন-সহচরের প্রতি কেমন প্রাণ-গত আকর্ষণ ছিল, তাহারই সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুক্তকেশী দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন, পড়াশুনায় যেমন উৎকৃষ্টা ছিলেন, তাঁহার স্বভাবটী যেমন ধৌত ও নির্ম্মল ছিল, হস্তের লিখাটীও তেমনি প্রশংসিত। যথার্থই যেন মুক্তাকলাপের ন্যায় তিনি অক্ষর যোজনা করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে দেবীরই স্বহস্ত লিখিত কয়টী শ্লোক পাইয়া পিতা তাঁহার প্রেমমুগ্ধ “প্রাণেশ্বর”কে তাহা প্রদান করেন। * তল্লাভে সেই গুণনিধান অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এইরূপে স্বাভিমত অভিব্যক্ত করেন। “স্বর্গীয়া মুক্ত-কেশীর সুন্দর হস্তলিখিত যে কয়টী শ্লোক পাঠাইয়াছেন, তাহা অমূল্য উপহার মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি সাধুর লক্ষণ যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আহা এমন সুন্দর আত্মা আর পৃথিবীতে দেখিব না! যাহাহউক, সাধুর লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ তিনি যাহা লিখিয়া

---

* পাঠক স্থানান্তরে সেই হস্তলিপি দর্শন করুন।

রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপদেশ মনে করিয়া জীবন এইরূপ সাধুত্ব ও ব্রাহ্মণত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।" ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই বিদ্যা-ধরীর জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত সদ্‌গুণ জীবনের আয়ত্ত হইতে ছিল। তিনি যেমন সুন্দর লিখিতে পারিতেন, পড়িতে জানিতেন, তেমনি সকল তত্ত্বের মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করিতে পটুতরা ছিলেন। শাস্ত্র-মধ্যে কোথাও কোন একটী ভাল কথা পাইলে, তাহা অমনি অতি অমূল্যধন বলিয়া লই-তেন। তাঁহার সেই যত্ন, সেই কৃতিত্ব মনে ভাবিতেও আনন্দ হয়।

স্বর্গীয়াদেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

পতিপরায়ণতা।

গন্ধ যেমন পুষ্পের মনোজ্ঞতা সম্পাদন করে, রূপ যেমন তাহার গাত্র-সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মনোহারিতা সম্পাদন করে, রস যেমন মধুকোষে সংলীন থাকিয়া পুষ্পের উপাদেয়তা অনুভাবিত করে; সতীভার্য্যা তেমনি পুরুষের আত্মাতে রস, জীবনে সৌন্দর্য্য ও প্রাণের সৌরভ হইয়া স্বর্গীয়তা বিধান করেন। সাধ্বী নারী ঈশ্বরের প্রিয়, দেবাত্মা সাধুগণের আদ্রেয় ও সমস্ত নর-কুলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিকা দেবী। তিনি পতির গৃহকার্য্যে

লক্ষ্মী, ধর্ম্মকর্ম্মে অর্দ্ধাঙ্গিনী সতী, ও প্রিয়ালাপে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী। আমাদের মুক্তকেশী যদিও এপর্য্যন্ত বাগ্‌দেবীরই সেবিকা, বাগ্‌বীণাই সতত অভ্যাস করিতে ছিলেন, তথাপি জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি আন্তরিক ভাবে সতী-মন্ত্রেই দীক্ষিতা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সতীর জীবনই ইহাঁর গূঢ় আদর্শ ও সর্ব্বথা অনুকরণীয়ছিল। ২৬শে আষাঢ় মুক্তকেশীর বিবাহের দিন, এই শুভদিনে পতিপত্নী উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য এই দিবসটী ইহাঁদের নিকট বড়ই আদরের হইয়াছিল। ১২৯৫ সালে ঐ তারিখ প্রাতে পিতার ধর্ম্মকুটীরেতে উভয়ের কল্যাণার্থ জগদীশ্বরের আরাধনা হয়, এবং দেবী গৌরীব্রত ধারণ করেন। অপরাহ্নে নিকটস্থ আত্মীয় সুহৃদ্‌দিগকে কিঞ্চিৎ সন্দেশ ও তাম্বুল দ্বারা সৎকৃত করেন। এইবার স্বীয় জীবন-সহচর সন্নিধিগত না থাকায় তিনি পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষাছিল, একবৎসরে হউক বা দুই বৎসরে হউক, পুরাণ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পতিসহ তাহাতেই পবিত্র ভাবে অবস্থিতি করিবেন। পতি যে স্থানেই চাকুরি করেন, তথায় ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত একটী আবাস প্রস্তুত করিতে ইহাঁর একান্ত বাসনা ছিল। তদর্থ পিতার নিকট হইতে শাস্ত্রোক্ত বৃহৎ পঞ্চবটির লক্ষণ লিখিয়া, তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। আর তিনি ইতি মধ্যেই একবার মৎস্য মাংসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু স্নেহময়ী

জননীর প্রতিবন্ধকতাতে আপাততঃ সেই সাধু অনুষ্ঠানে নিবৃত্ত থাকেন। আহা! পুণ্যশীলা সতীর চিত্ত যেন স্বতঃই ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য একান্ত লোলুপ ও চির-পরিচিত কোন গুহ্য পুণ্য-ধামে প্রবেশেচ্ছু ছিল! আবার সৌভাগ্যের কথা এই, পতি সততই অনুকূল ও নিয়ত পৃষ্ঠ-পোষক। তিনি একপদ চালন করিতে চাহিলে পতি সপ্তপদ অগ্রসর করিয়া দিতেন, এবং প্রাণগত যত্ন ও হৃদ্‌গত প্রণয়োপহারে নিত্য সতীর কত সমাদর করিতেন। ভগবান্ যেন এক অপূর্ব্ব মণি-মাণিক্যেরই যোগ করিয়া দিয়াছিলেন! ইহাঁরা কে কাহাকে অধিক সম্মান ও সমাদর করিতেন, লেখক তাহা অবধাবণ করিতেও অসমর্থ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, উভয়ই উভয়ের তুল্যরূপ অনুকূল ও প্রকৃত জীবন-পথের নিয়ত সাহায্যকারী ছিলেন। লেখক জানেন, উভয়েরই হৃদয় উচ্চ প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ও উভয়েরই প্রণয়-সৌভাগ্য নিয়ত সরল ধর্ম্মবিধানে পরিপুষ্ট হইতেছিল।

গৌহাটী অবস্থান কালে কোন কার্য্যোপলক্ষে পিতা স্বদেশে চলিয়া গেলে বহু অনুরোধেরপর শরৎবাবু গৌহাটীতে আগমন করেন। তৎকালে ইহাঁর আসিবার বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল, তাহা যদিও সেই সময় সকলে অবধারণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অত্যল্প সময় পরেই দেখাগেল, তিনি সেই গ্রীষ্মাবকাশে গৌহাটীতে না আসিলে মুক্তকেশীর বিবাহ-জীবনেব একটী অধ্যায় নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিত। তিনি বিবিধ শাস্ত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া পতি-সেবা ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যে বিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কার্য্যই তিনি করিয়া যাইতে

পারিতেন না। কেহ লক্ষ্য করুক আর নাই করুক, সুগন্ধি পুষ্প যেমন গোপনে ফুটিয়া আবার গোপনেই ঝরিয়া পড়ে; সতীসাধ্বী বালিকা মুক্তকেশীরও হৃদয়-স্ফুরিত ভাব কুসুম তেমনি নীরবে সুগন্ধ দিয়া নীরবেই ঝরিতেছিল। মুক্তকেশীর জীবনে ইহাও একটী অতীব উচ্চ মহত্ত্ব যে, ইহাঁর প্রেম বড় সুন্দর লুকান ছিল; স্নেহময়ী জননী ভিন্ন তাঁহার সেই অমূল্য-রত্ন খনিতে প্রায় কাহারও দৃষ্টি যাইত না। কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় এইবার কয়েক দিন তিনি মনের সাধে পতিসেবা ও তৎপরিচর্য্যা করিতে পারিয়াছিলেন। দেখাগিয়াছে, পতির কোন আদেশ পালন করিতে পারিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, তিনি যেন তাহাতে কতই সুখানুভব করিতেন। আর তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব পতির একসঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত, এইবার তাঁহার সেই গুহ্য বাসনাটীরও কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা হইয়াছিল। কিছুদিন পর পিতা গ্রীষ্মাবকাশে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া গৌহাটীতে প্রত্যাগত হইলে শরৎ বাবুর পুঁঠিয়া যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ইহাঁরা পতিপত্নী এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে স্নান করিয়া নিরতিশয় আগ্রহের সহিত নির্জ্জনে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। অহো এই দিন যে মুক্তকেশীর আনন্দ! তিনি যেন ইহাতে কতই কৃতার্থতা লাভ করিলেন! সেই দিবস সমস্ত দিনই তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল। কিন্তু হাসি ও ক্রন্দন, প্রসন্নতা ও বিষণ্ণতা কিছুই লোকের স্থায়ীভাব নহে। সতত ভাবের বিপর্য্যয় বা অবস্থার আবর্ত্তনই যেন নিয়তির বিধি। দুই

দিবস পর আবার শরৎবাবুর পুঁঠিয়ায় যাইবার সময় উপস্থিত হইলে মুক্তকেশীর অন্যমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইল। যাহাহউক অবস্থানুসারে এই ভাব-বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ বলিতে হইবে; প্রসন্নতা হউক আর বিষণ্ণতাই হউক, সময়ানুসারে সকলেরই মাহাত্ম্য আছে। তজ্জন্য আমরাও তাঁহার সেই লুকান প্রেম, লুকান হাসি ও লুকান অশ্রু-বর্ষণের একান্ত সম্মান ও সমাদর করি। পরন্তু ইহাও একটী অতি প্রশংসার কথা যে, তাঁহার মনে শত দুঃখ থাকিলেও তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। পতিপ্রাণা সতী এইবার স্বহস্তে পতির পাথেয় ভোজ্য ও তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নের সহিত বাঁধিয়া ছাঁদিয়া দেন। অন্যান্যবার পিতা এই সকল কার্য্য করিতেন, এইবার সতী অগ্রেই স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া নিজহস্তে নিতান্ত প্রবীণার ন্যায় সমস্ত করিলেন। কার্য্য অবশ্য একজন করিলেই হয়, কিন্তু হৃদ্‌গত ভাবটুকু সকলের নিকট হইতে সমান ভাবে আসিয়া হৃদয়স্পর্শ করে না। পাঠক হয়তো ইহাতে একটুকু নির্লজ্জতা মনে করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক নির্লজ্জতা নহে, ইহাই সাধ্বী-জীবনের অতি প্রশংসিত সৌন্দর্য্য ও দেবভাব। লজ্জা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান যখন কাহাকেও কেহ নিপীড়ন না করিয়া সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করে, তখনই ইহারা নারী-জীবনের দেবত্ব ও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। এই জায়াপতির এইবারের সম্মিলন যেন ঈশ্বরেরই এক বিশেষ অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। যেহেতু ইহাতে সংক্ষেপে এই ভাগ্যবতীর জীবনের চরিতার্থতার অনেক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহাহউক, স্বামীকে দুঃখেকষ্টে বিদায়

করিয়া দুই তিন বিস আর তাঁহার পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। কে জানে কি মনে করিয়া এ কয়দিন তিনি কেবলই নানা গ্রন্থ হইতে পতি-ভক্তি ও পতি-সেবার অনুকূল বিবিধ বচন-প্রমাণ সংগ্রহ ও আয়ত্ত করেন। এই সময় এই অমূল্য রত্ন ইহাঁর জ্ঞানকোষে সঞ্চয় করিয়া লইবার কি প্রয়োজন ছিল, বুদ্ধিমান্ পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। যিনি ইতি পূর্ব্বে সাধু-লক্ষণ, জ্ঞান-লক্ষণ, ভক্তি-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব বিশেষরূপে শাস্ত্রপাঠে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাঁকে এই সুযোগে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়াও অবশ্যই প্রেরয়িতা পুরুষের অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে লেখক কোন সন্দেহ করেন না। এই শাস্ত্রই ভারত-মহিলার আদরের সামগ্রী, এই জ্ঞানেতেই ভারত-রমণী জগতের পূজ্যা। ভারত ভিন্ন আর কোন্ দেশের নারী মস্তকের কেশ-রাজী দিয়া স্বামীর চরণ মুছাইয়া থাকেন; স্নান করিয়া ভর্ত্তার চরণামৃত পান করেন; নিত্য দেবতার মত ভক্তিভাবে পতির সেবা করেন; মৃতে ভর্ত্তার জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া লোকান্তরেও সেই সকৃৎ পরি-গৃহীত স্বামীরই সঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন? আমাদের স্বর্গ কন্যা মুক্তকেশীও অবশ্য এই সকল গুণ ও জ্ঞানেরই লোভী হইয়া বিবিধ শাস্ত্রতত্ত্ব সংগ্রহ করেন। তাঁহার পতিপরায়ণতা এই সকল শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত মিশিয়া আরও অতি উপাদেয় হইয়া উঠে। তিনি এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের উচ্চ-জ্ঞান ও ভাবুকতা দেখিয়া সময়ে সময়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পতি-ভক্তি-সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞান ও ভাব আধুনিক সময়ে উপে-

ক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও তিনি অতি সুন্দর ভাব যোজনা করিতেন। বাস্তবিক সদর্থ যোজনা করিতে না পারিয়াই লোক অনেক বিষয়ে অস্বর্গ ও অকল্যাণ দর্শন করে। কিন্তু আমাদের মুক্তকেশীর এই দোষ ছিল না, তিনি সকল বিষয়েরই সদর্থ খুঁজিয়া লইতেন। দোষই হউক আর গুণই হউক, এই জন্যই তাঁহাকে অনেক সময়ে রক্ষণ-শীলা বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বাস্তবিক ইহা প্রবীণতারই লক্ষণ।

স্বর্গীয়দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

পিতৃমাতৃভক্তি।

স্বীয় প্রেমাস্পদ প্রিয় সহচর পুঁঠিয়ায় প্রস্থান করিলে তিন দিবসের পর আবার পিতার আদেশ-ক্রমে মুক্তকেশী পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হন। পিতার আদেশ তিনি কখনও জীবনে উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ইনি নিতান্তই পিতৃভক্তা ও নিরত পিতার আজ্ঞাকারিণী ছিলেন। ইঁহার পিতৃভক্তি দেখিলে বোধ হইত যেন পিতৃ-আদেশ পালন করিবার জন্যই সংসারে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। মুক্তকেশীর ইহাও এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, তিনি যখন যাহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন, সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহারই অনুগতা ও আজ্ঞাধীনা বলিয়া বোধ হইত।

বাস্তবিক ইনি পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় দিকেরই সৌভাগ্য-বর্ত্তিকার একটী দীপকলিকারূপে জ্বলিতেছিলেন। আহা পিতৃ-বৎসলা কন্যা ইতিমধ্যেই পিতার প্রতি কত স্নেহ ও কত ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছেন! তিনি জানিতেন পিতার আয় অল্প, ব্যয় অধিক, তাহার উপর আবার ঋণের উদ্বেগ আছে। এই নিমিত্ত স্বামী হইতে মাস মাস যে অর্থ সাহায্য পাইতেন, তাহা নিজের কোন কার্য্যে ব্যয় না করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধার্থ প্রতিমাসে ১০৲ টাকা করিয়া স্বয়ংই প্রাপকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর মাতাঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "তোমার নিজের কার্য্য না করিয়া সমস্ত টাকা কেন দিয়া ফেল?" তখন তিনি মাতাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন,—"মা! আমার প্রয়োজন হইতে বাবার প্রয়োজন অধিক; আমার এই সব সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু ব্যয় না করিলেও চলে, কিন্তু বাবার উদ্বেগ নিবারণ করা আমার নিতান্ত আবশ্যক। আমি ইহাঁর জন্যই টাকা পয়সা রাখি, ইহাঁর অভাবের সময় সাহায্য করিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট বোধ হয়।" আহা কেমন সুবুদ্ধি, পিতার জন্য তাঁহার কেমন গভীর ভাল-বাসা! প্রকৃত পক্ষে ইনি পিতার ঐহিক জীবনের এক অতি সুমহৎ বল ছিলেন। দেখা গিয়াছে মুক্তকেশী আত্মভোগের নিমিত্ত কিছুমাত্র অভিলাষ করিতেন না, পর-সেবাই তাঁহার ব্রত ছিল, এবং তাহাতেই তিনি সাতিশয় আপ্যায়িতা হইতেন। হা ধন্য তাঁহার সাধু জীবন! পরায়ত্ততাই এ জীবনের সৌন্দর্য্য, ও ভোগ-নিস্পৃহতাই ইহার যথার্থ মহত্ত্ব।

এই ভাগ্যবতী মাতার প্রতিও অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি যে গৃহকার্য্যে মাতার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেন না ও মাতাকে বাসনানুরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত ভগিনী স্বর্ণপ্রভার নিকট অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। সরলা কন্যা পুঁঠিয়ায় অবস্থান কালে একবার মাতাকে লিখিয়াছিলেন, "মা! আপনি কাছাড়ে থাকিতে আমাকে বলিতেন যে, আপনার প্রতি আমার মায়ামমতা নাই এবং আমি আপনার জন্য কাঁদিব না। হা স্নেহময়ি! হৃদয়ে কত যে কষ্ট ঢাকিয়া রাখি, তাহা আর এই সামান্য লেখনী দ্বারা কি ব্যক্ত করিব। আমার প্রাণ যে সর্ব্বদাই আপনাদের জন্য ছট্‌ফট্ করে। কিন্তু কি করি, মনের দুঃখ মনেই ঢাকিয়া রাখি।" এই "ছট্‌ফট্" ও "মনের দুঃখ মনেই ঢাকিয়া রাখি," এই বাক্য দুইটীর অর্থ বঙ্গের কুলবধূগণই উত্তম বুঝিতে পারিবেন। আর "এই সামান্য লেখনী দ্বারা কি ব্যক্ত করিব," ইহাও একটী সত্য কথা; বাস্তবিক মাতার বিচ্ছেদ, পিতার বিচ্ছেদ ও শৈশব-সহচর ভ্রাতা ভগিনীর বিচ্ছেদে কি যে কষ্ট, তাহা কি লিখাতে প্রকাশ করা যায়। সাধুশীলা কন্যা কিছুদিন পর আবার অন্য এক পত্রে জননীকে লিখিয়াছিলেন, "মা! আপনাদের কথা মনে হইলে চক্ষের জল রাখিতে পারি না। যোগেন্দ্রের মধুমাখা ডাক মনে হইলে কি যে কষ্ট হয়, তাহা পত্রে কত লিখিব। ইহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবেন। মা! কাছাড়ে থাকিতে আপনার নিকট কত যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। বাবা একদিন ভাগবত

হইতে একটী শ্লোক আমাকে শিখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে সন্তান পিতা মাতার মনের ভাব বুঝিয়া অগ্রেই কার্য্য করে, সে উত্তম সন্তান; বলিলে যে করে সে মধ্যম; আর বলিলেও বিরক্ত হইয়া যে করে সে অধম। মা! তবে আমি আপনার সেই অধম সন্তান। আমি কত সময় আপনার কথা শুনি নাই; তাহা মনে হইলে এখন কত যে কষ্ট হয়, ভগবান্ জানেন। যাহাহউক, অধম সন্তান বলিয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" এই চিঠিখানাতে মুক্তকেশীর অত্যন্ত প্রশংসার কথা ও একটী অত্যন্ত নিন্দার কথা অভিব্যক্ত হইতেছে। প্রশংসা এই যে, তিনি কেমন যত্ন করিয়া পিতার উপদেশগুলি মনে রাখিতেন। আর নিন্দার কথা এই, তিনি বাল্যকালে জননীর কিঞ্চিৎ অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এ ত্রুটি মুক্তকেশীর নহে, ইহা তাঁহার পিতারই একমাত্র কার্য্যফল বলিতে হইবে। তিনি প্রতিদিন ইহাঁর উপর এত লিখাপড়ার ভার চাপাইয়া রাখিতেন যে, তাহা ফেলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও মুক্তকেশী মাতার সাংসারিক কার্য্যের সাহায্যার্থ যাইতে পারিতেন না। তাহাতেই মায়ামমতা নাই বলিয়া মাতা মধ্যে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক, বালিকার মুখে "মা! তবে আমি আপনার সেই অধম সন্তান" এই কথাটী বড় মিষ্ট বোধ হইতেছে। লোক সময়ে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত বা লোকান্তরিত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু জীবন অপূর্ব্ব ভাগবত হইয়া অনন্তকাল জীবলোকে ও ঈশ্বর সন্নিধানে জীবিত থাকে। আমাদের পুণ্যময়ী মুক্তকেশীরও সেই সুধাসি

ভাবময় জীবনই পাঠ করিয়া এইরূপে আমরা পরিতৃপ্ত হই-তেছি।

কিছুদিন পর মুক্তকেশীর পিতার গৌহাটী হইতে পুনশ্চ কাছাড় স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে মুক্তকেশীর যে কত আনন্দ! কাছাড়ে অনেকেই তাঁহার পিতার অতি হিত-কারী বন্ধু, তাঁহারা শিশুকাল হইতেই মুক্তকেশীকে অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদর করিতেন, এবং তিনিও পিতার সেই সদ্‌বন্ধুদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এতদ্ভিন্ন ভদ্র মহিলাবর্গের মধ্যেও তাঁহাকে আন্তরিকভাবে স্নেহ মমতা করেন, এরূপ অনেক আছেন; তাঁহাদিগকেও আবার বহুদিনের পর দেখিতে পাইবেন বলিয়া ইঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। সেই আনন্দ ও তদনুসারে মনের একান্ত ব্যগ্রতা বশতঃই তিনি তাঁহার পিতার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "জাহাজ শিলচর-ঘাটে লাগিলেই ভরসা করি আমরা আপনাদিগকে তথায় দর্শন করিতে পাইব।" তদনুসারে সেই সুমিষ্ট বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া তিনি কিরূপে ও কীদৃক্ সমাদরের সহিত জাহাজ-ঘাট হইতে মুক্তকেশী ও তৎপিতা মাতাকে স্বভবনে আনয়ন করিবেন, তাহা পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করিয়া রাখেন। এই সকল কথা ও কল্পনা যদিও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, যদিও শত্রু-কৃত বিরুদ্ধাচরণ তাহার অন্তরায় হইয়াছিল; তথাপি তন্মধ্যে যে হৃদয়-স্পর্শী স্বর্গীয়তা ও ভাবের সজীবতা ছিল, এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে বিমলানন্দ উপজাত হইয়া-ছিল, তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু পরে আবার মুক্তকেশী যখন শুনিলেন, কতকগুলি লোক পিতার কর্ম্মপ্রাপ্তির

ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হন। পিতৃবৎসলা কন্যা পিতার বিরুদ্ধে কখনও কিছু শুনিলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন। কিন্তু আবার কাহারও মুখে প্রশংসা শুনিলে তাঁহার আনন্দেরও সীমা থাকিত না।

যাহা হউক, কিছুদিন পর আবার মাতার জন্যেও তাঁহাকে মহাদুঃখে পতিত হইতে হয়। ১৫ই শ্রাবণ ইঁহার মাতাঠাকুরাণীর ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়। তাহাতে মুক্তকেশীর যে ব্যাকুলতা! তিনি কাঁদিয়া একেবারে অস্থির। মনস্বিনী মাতৃবৎসলা কন্যা তৎসময়ে মাতৃ-হীনা হইবেন বলিয়া মনে মনে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। একদিন মাতা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া একেবারে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া যান ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তদ্দিবস রাত্রিতে বন্ধুবান্ধব সকলে মিলিয়া রোগের উপশম নিমিত্ত ঈশ্বর-নিকটে ভক্তির সহিত প্রার্থনা করেন, এবং ভগবানের কৃপায় তৎপর দিবস হইতেই মাতা ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন। তাহাতে এই পরিবারের সকলেই যেন ঈশ্বরের এক মহা অনুগ্রহ ও অতি অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, এরূপ অনুমিত হইল।

কিন্তু সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং শান্তি ও উপশম সকলই ক্ষণিকমাত্র। আকাশের প্রবল ঝঞ্ঝাকারী বায়ু আবার দিগন্তর দিয়া ছুটিল। এই ভীম প্রভঞ্জনের সম্মুখে পড়িলে মনোহর উদ্যান বা সুদৃশ্য তরু-বল্লী কাহারও অব্যাহতি নাই। ক্ষণকাল-মধ্যে ইহা সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

প্রবল ঝটিকা।

এই ভব-সমুদ্রে এমন নাবিক কে আছে, যাহাকে একদিনও প্রবল ঝড়ের সম্মুখে পড়িতে হয় নাই, এবং একদিনও যাহার পোত এই মহাসমুদ্রে বিড়ম্বিত নহে? কিন্তু ইহাই সৌভাগ্য যে, ঠিক এক মুহূর্ত্তে সকল নাবিকের ভাগ্য অপ্রসন্ন হয় না ও সকল ঝড় একই সময়ে সকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে না। তাই এখানে কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ সুখে পড়িয়া নিদ্রা যায়। আর কেহ বা ভয়ে ও আতঙ্কে লুকাইবারও স্থান প্রাপ্ত হয় না। মুক্ত-কেশীর মাতাঠাকুরাণীর আরোগ্যলাভের পর ক্ষণিক শান্তি হইতে না হইতেই আর একটী অতি প্রবল ঝটিকা আইসে, তাহাতে এই পরিবারের সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

২৫ শে শ্রাবণ অতি প্রত্যূষে পুণ্যময়ী মুক্তকেশী নিত্য অনুষ্ঠেয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পিতৃ-মাতৃ-চরণ বন্দনা-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন। এই তাঁহার শেষ পাঠ ও চরম পুণ্যানুষ্ঠান। দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত অধীত হইলে পিতা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় রন্ধনার্থ তাঁহাকে অনুজ্ঞা করেন। তাহাতে সতত আজ্ঞাকারিণী, পিতৃ-ভক্তা তনয়া তৎক্ষণাৎ পুস্তক বন্ধ ও ভূমিষ্ঠভাবে প্রথমতঃ ঈশ্বর ও তৎপর গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া রন্ধনশালায় গমন করেন; এবং অতি শ্রদ্ধার সহিত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে

পরিবেশন পূর্ব্বক পিতা, মাতা ও ভাই ভগিনী সকলকে ভোজন করান। তৎপর স্বয়ং অর্দ্ধ-ভোজন করিতে না করিতেই কাল-চর আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমবার ভেদ হইবার পর তিনি কিছু-কাল নিদ্রা যান। তৎপর অপরাহ্ণ ৪ টার সময়ে পিতা বাসায় আসিয়া দেখেন, মুক্তকেশীর তিনবার ভেদ হইয়াছে। তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া ডাক্তর দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করান। কিন্তু ঔষধের সঙ্গে সঙ্গেই উপর্য্যুপরি বারবার ভেদ হইতে থাকে। ক্রমাগত ১৩ বার ভেদ হইবার পর সায়ংকালে ডাক্তর সাহেব দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হয়। তাঁহার পিতা সেই রাত্রিতেই জামাতাকে তারে সংবাদ প্রদান করেন, এবং ব্যাকুল হইয়া সকলেই রোগীর শুশ্রূষা করিতে থাকেন। হায় ঈশ্বরের কেমন ইচ্ছা, বিপদের উপর বিপদ! ২৭ শে শ্রাবণ রাত্রিতে মুক্তকেশীর অতি প্রিয়তম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথেরও ঐ পীড়া উপস্থিত হয়। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই বালক গৃহান্তরে শায়িত ছিল, উক্ত রোগই তাহাকে তথায় যাইয়া জাগ্রত করিল। সেই-খানে একবার বমি হইবামাত্রই পিতা যাইয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া আইসেন। এইখানে আসিয়া উপর্য্যুপরি দুইবার ভয়ানক ভেদ হয় ও দেখিতে দেখিতে দুরন্ত রোগ ছেলেটীকে ঝাপটাইয়া ধরে। তখন পিতা ইহাকে শয্যান্তরে লইয়া মাতাকে প্রহরিণী রাখিয়া স্বয়ং প্রাণতুল্যা কন্যা মুক্তকেশীর নিকটে থাকেন। ইহাঁরও মধ্যে মধ্যে বমনোদ্রেক ও বারবার জল-শোষ হইতেছিল, এবং বাতাস দিবার নিমিত্ত ইনি পিতাকে পুনঃপুনঃ ডাকিতে-ছিলেন। এদিকে অপর শয্যায় থাকিয়া প্রিয়পুত্র যোগেন্দ্র

বাবার কোলে উঠিবার জন্য অস্থির হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে "বাবা আমার নিকটে আসুন" বলিয়া বারবার ডাকিতেছিল। ওঃ কি বিপদ্‌ কি বিপদ্‌! এই সময়ে আবার মুক্তকেশীর ছোট ভগিনী চারুপ্রভা অপর রুগ্নশয্যায় একা নিপতিতা থাকিয়া কাতর স্বরে বলিতেছিল, "হা আমি কাহার কাছে যাইব!" হা কি কষ্ট কি কষ্ট। কি ভয়ানক সময়, এমন বিপদেও কি কাহারও বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে? এই ছোট কন্যাটী ৪।৫ দিন যাবৎ উদরের পীড়ায় ও কৃমির দোষে কাতরা ছিল। পিতা এক এক বার তিন জনেরই বাহ্যে বমি লইয়া স্থানান্তরে ফেলেন, ও কখন এর কাছে, কখন তার কাছে যাইয়া ঔষধ দেন, জল দেন এবং সান্ত্বনা করেন। এই বিপদে ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র বৰ্দ্ধন মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের যত্নের সীমা ছিল না, এই ছেলেটীও ইহাঁর নিত্য অনুচর ও একান্ত স্নেহপাত্র ছিল; তাহাকে তিনি নিজেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঔষধ ও পথ্য দিয়া চিকিৎসা করেন। এই দারুণ বিপদ অষ্টাহকাল জীবিত থাকে, এই সময় ভক্তিভাজন অভয় বাবু ও মুক্তকেশীর পিতার পরম সুহৃদ্‌ বৈকুণ্ঠ বাবু এবং অতি প্রিয়তম ছাত্র বাবু দীননাথ দাস নানা বিষয়েই সাহায্য করেন। রাত্রি জাগরণ ও দণ্ডে দণ্ডে দৌড়িয়া চিকিৎসকের নিকটে যাওয়া, ঔষধ আনা ও পথ্য সংগ্রহ করা ইহাঁদের কার্য্য। অতি সত্বর ও মহাব্যাকুলতার সহিত ইহাঁরা তৎসমুদায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ লোক যথার্থই আৰ্ত্ত-বন্ধু ও বিপদের সহায়।

২৮ শে তারিখ রাত্রিতে শরৎ বাবু গৌহাটীতে পঁহুছেন;

ইহাঁকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া মুক্তকেশীর বড়ই উৎকণ্ঠা ছিল, এইক্ষণে ইহাঁকে পাইয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। কিন্তু মৃত্যু যে অবধারিত, ইহা বোধ হয় তাঁহার বুঝিবার বাকী ছিল না, এই জন্যই কিছুমাত্র লজ্জা বোধ না করিয়া—সেই ব্যাকুলিতাবস্থায় দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক "প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!" বলিয়া অতি করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রিয় জীবন-সহচরের কণ্ঠ-লগ্না হইয়া থাকেন। কিন্তু হায়! বৃথা বিলাপ; কালের দুরন্ত কোপ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না; ক্রমেই ঝড় প্রবলতর হইয়া বহিতে লাগিল।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

ভ্রাতৃশোক।

একই উদ্যানে যে সকল ফল পুষ্পের গাছ রোপিত হয়, যাহারা পরস্পরকে নিত্য শোভা দেয় ও ছায়া দান করে; তাহাদের মধ্য হইতে একটীর স্থানচ্যুতি বা ভঙ্গাপত্তিতে নিশ্চয় অপরেরও সৌন্দর্য্য ভঙ্গ হয় এবং তদুপরি একটী বিষাদের ছায়া পড়ে। সেই ছায়া মানব প্রকৃতিতে আরও জীবন্ত দুঃখকর ও নৈরাশ্যজনক; তাহার পুনঃপুনঃ অনুভূতিতেই মনে হতাশ, চিত্তে বিষাদ ও প্রাণে দাহন উপস্থিত করে। বাস্তবিক সকল সুহৃদ্ হইতে একের অন্তর্ধান বা বিলোপ চিন্তা করাই অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষতঃ রোগের সময়ে ও অত্যন্ত প্রাণসংশয় অবস্থায়

সেই দুঃখ, সেই তাড়না ও সেই সন্তাপ আরও চিত্ত-শোষক। কিন্তু আমাদের শান্তা, সুধীরা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সেই রমণী-রত্ন উপস্থিত দুঃখ কষ্ট সকলই নীরবে সহন করিয়াছিলেন।

৩০ শে শ্রাবণ মধ্যাহ্ন ১০ টার সময়ে মুক্তকেশীর অতি আদরের ভ্রাতা হরিনাম-পিপাসু শিশু যোগেন্দ্রনাথ পিতার ক্রোড়ে থাকিয়াই তনুত্যাগ করিলেন। প্রয়াণ-কালে জনক-জননী দুই জনই ভগ্ন-চিত্তে ও দুঃখিত-মনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ, নাড়ী অবসন্ন, চক্ষুস্থির ও প্রাণ রুদ্ধ হইয়া গেল। আহা সেই দৃশ্য কি প্রাণহর ও কি নৈরাশ্যজনক! এই বালক তিন দিন তিন রাত্রি রোগের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার যেন এই রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে নিতান্তই অনিচ্ছা ছিল, তথাপি দুরন্ত শত্রু ছেলেটীকে বলপূর্ব্বক দেহবাস হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। তখন আর পিতা মাতা কি করেন, অনন্যোপায় হইয়া ভগবানের কাছে এই শিশুর মুক্তির জন্য সাশ্রুনয়নে, বিগলিত হৃদয়ে ও করযুড়ে প্রার্থনা করিলেন। তৎপর তাহাকে তাহার অতি প্রিয় পরিধেয় পরিধান করাইয়া একখানা কাষ্ঠাসনে স্থাপন পূর্ব্বক এক-খানা উড়নী দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। তদনন্তর পিত্রাদি সুহৃদ্গণ তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ ও শিরোদেশ ধান্য দুর্ব্বা দ্বারা সমাদৃত করিলে দুইজন বিপ্র বিষ্ণুদূতের ন্যায় ইহাকে অন্ত্যেষ্টি-ভূমিতে লইয়া চলিলেন। পিতাও একাগ্র হৃদয়ে হরিনাম বলিতে বলিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বিপ্রদ্বয় গৌহাটীর দক্ষিণে ভরলুনদীর তীরে শবাসন নিয়া স্থাপন করি-

লেন। তৎপর ভৃত্য-বর্গ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিলে অচিরে চিতা প্রজ্বলিত হইল। পিতা তিনবার প্রদক্ষিণ ও বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিয়া অমনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হা কেমন হাস্য হাস্য মুখখানা দেখিতে দেখিতেই অগ্নি বিবর্ণ করিয়া ফেলিল; ক্রমে চক্ষুঃ, নাসিকা ও মুখ গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর আর কি চিতাগ্নি ধা ধা করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ধরিল। পিতা নিকটে বসিয়া গণ্ড-স্থলে হাত দিয়া আদ্যন্ত সমস্ত কাণ্ডটী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। অহো স্বল্প-কাল মধ্যেই একটী নর-শিশু লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া গেল!

এই বালকের জন্ম-সময়ে তৎপিতা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই শিশু বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই একজন ভক্ত সৎপুরুষ হইবে। বাস্তবিকও এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যোগেন্দ্রকে অনেকে সাধুভক্ত বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহার পিতার একজন ধর্ম্মবন্ধু কাছাড় শিলকুড়ি বাগিচার কেরাণী বাবু গোলোকচন্দ্র দেব প্রায়ই পত্রে পত্রে জিজ্ঞাসা করিতে "আপ-নার সাধু পুত্রটী কেমন আছে?" কাছাড়ে থাকিতে হরিমোহন কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গীয়া তাপসী ভগিনী কালীতারা সেনজা এবং কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং ইহাকে ঠাকুর বলিয়া উপাদেয় ভোজ্য ও দুগ্ধাদি পানীয়দ্বারা নিত্য সমাদর করিতেন। আর অন্যান্য প্রতিবেশীর নিকটেও এই ঠাকুরের বড় প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল। এই বালক তাহার পিতার নিতান্ত বাধ্য ছিল; এমন কি আসন্ন-মৃত্যুর সময়েও ঔষধ সেবনার্থ পিতা নাম ধরিয়া ডাক দিলেই মুদিত নয়নে অমনি মুখব্যাদান করিয়াছে। ভাল সময়ে

পিতা কখন কখন আদর করিয়া তাহাকে কণ্ঠমণি বলিতেন। তাহার দৈনিক স্নান-ভোজন ও শয়ন সকলই পিতার এক সঙ্গে হইত। এমন কি দৈনিক ভজন-পূজনেও সে তাহার পিতার আশ্রয় ছাড়িত না, অনেকদিন ঈশ্বরের আরাধনায় বসিয়াও পিতা তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দিতে বাধ্য হইতেন। এই সকল দেখিয়া কাছাড় বর্ণারপুর বাগিচার ম্যানেজার বাবু দীননাথ দত্ত একদিন এই বালককে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাবাকে কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা তোমার নিকটেই ভালরূপ শিক্ষা করিলাম।" এই শিশু কখন কখন আসন পাতিয়া তদুপরি পদ্মাসন করিয়া মুদিত নয়নে ও ব্যাকুলচিত্তে শতাধিকবার "হরিবল হরিবল" এই বাক্য অতি গম্ভীরভাবে কখন করযুড়ে কখন বা করতালি দিয়া উচ্চারণ করিত। তৎকালে তাহা দেখিয়া অনেকে হাসিতেন, কিন্তু সেই বালক তাহাতে দৃক্‌পাতও করিত না। বরং আরও উৎসাহিত হইয়া করতালির সহিত মুদিত নেত্রে তাহার গীত সে গাইত। এই অপূর্ব্ব রহস্য দেখিবার জন্য কাছাড় অবস্থান সময়ে বাবু রমেশচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কোন কোন দিন কৌতুক করিয়া একান্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত বলিতেন "মামা একবার বসিয়া উপাসনা কর।" এইরূপ সমাদরে যদি তাহাকে একবার আসনে বসাইতে পারিলেন, তখন আর ক্ষান্ত করে কে? তিনি তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে বসিয়া গেলেন; শত কথা বলিলেও একবার হাসিতেন না, অন্য বাক্য উচ্চারণ করিতেন না, এমন কি কাহারও দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিতেন না। তৎপর গৌহাটীতে আসিয়াও অযাচিতভাবে তিন

চারি দিবস ঐরূপ নাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। কে বলিবে এই কীর্ত্তনের সঙ্গে এই ভক্ত শিশুর কি গূঢ়তম যোগ ছিল। কি আশ্চর্য্য! পাঁচ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তাহাতেই ইহাঁর কেমন ভক্তি ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এইরূপ স্বাভাবিকী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূলে কোন নৈসর্গিক কারণ নিহিত ছিল কি না ঈশ্বর জানেন। আহা ঠাকুর ইহাঁর প্রতি দয়া করুন! তাঁহার পদতলে এই ভক্ত বালকের স্থান হউক। যোগেন্দ্রনাথের আর একটী গুণ ছিল, তিনি যখন যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে আর অন্য কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, ইহাতে তাঁহার চিত্তের একান্ত দার্ঢ্য-ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। আর ইনি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ চঞ্চল ছিলেন, ইহাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলিয়াই পিতা অনুমান করিতেন। এই দ্বিজ-শিশু অল্প বয়সেই আরও অনেকটী সদ্‌ভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিলে, আর কেহ ভিক্ষা দিতে পারিত না, ইহা তাঁহারই এক-মাত্র অনুষ্ঠেয় কার্য্য ছিল। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ও বসন ভূষণ পরিধান করিতে ইহাঁর বড়ই আনন্দ হইত। ফুলের মালা পাইলে নিতান্ত আদর করিয়া গলায় পরিতেন। কখন কোথাও সমাজ কিম্বা অন্য সভার জন্য আসন বা শয্যা পাতিত হইলেই তিনি তাহাতে যাইয়া অগ্রে আসন করিয়া বসিতেন ও ভাবতঃ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সেই গম্ভীর-হর্ষ-বিস্ফারিত মুখকান্তি এখনও লিখকের মনে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অহো প্রভু এই দ্বিজ-নন্দনকে স্বর্গের সভাসদ্ করুন, পর জগতেও সাধু মণ্ডলীর সভায় ইহাঁর স্থান হউক।

মুক্তকেশীর এই বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরাক্রান্ত সাধু ভাই, যিনি বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবার সময়ে পিতার অগ্রে অগ্রে চলিয়া অক্লেশে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন ও যিনি ক্রীড়াকালে সহচর ক্রীড়ক বা অন্য কাহাকেও ভয় করিতেন না; সেই অতি সাহসী প্রিয়তম ভ্রাতা পরলোকেও অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহাকে চিতা-ভূমিতে লইয়া যাইবার সময়ে দুঃখিনী মাতার রোদন-ধ্বনি শুনিয়া রুগ্নশয্যায় শায়িতা মুক্তকেশী কাতর স্বরে একবার মাত্র অভয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঠাকুর-দাদা! আমার যোগু ভাই কি নাই?" তৎপর আবার নিজে নিজেই "হায় রে আমার যোগু ভাই নাই!" এই বাক্যটী নিতান্ত আর্ত্তস্বরে বলিয়াই চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। তৎপর আর একবার পার্শ্বস্থিত স্বামীকেও পূর্ব্ববৎ ঐ শোক-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াই নীরব হন। কে বলিবে, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়া দেবী কি চিন্তা করিতেছিলেন?

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

স্বর্গারোহণ।

স্বর্গ কিরূপ স্থান, তথায় দেবদলে বা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে কিরূপে কাহাদ্বারা মৃতাত্মা নীত, সমাদৃত বা পরিগৃহীত, তাহা কাহারও বিদিত নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতকাল যাবৎ কত লোকই এই রাজ্য হইতে চলিয়া গেল, একটীও ফিরিয়া

আসিয়া একদিন কোন তত্ত্ব বলিয়া গেল না। অধ্যাত্মবাদিগণ যাহাই বলুন, আমরা সেই অদৃশ্য ও সম্যক্ অপরিজ্ঞেয় রাজ্যের কোন তত্ত্বই বর্ণন করিতে চাহি না। আমরা এই মর্ত্যধামে থাকিয়া যতটুকু লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, যত সাধু, সজ্জন ও মহাপুরুষ, সকলেই সেই দিব্যধাম ও শান্তি-নিকেতন দেখিবার জন্য সমুৎসুক ও আশান্বিত। যোগী, তাপস, জ্ঞানী, কর্ম্মী সকলেরই চিত্ত যেন সেই অদৃশ্য স্বর্গলোকের প্রতি আকৃষ্ট। গূঢ়ভাবে সকলেরই প্রাণ সেই নিত্য-নিকেতনের পুণ্য ও শান্তির আশা করে। যোগীর যোগ, কর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠান, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত ও জ্ঞানীর জ্ঞান-চর্চ্চা কেন হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই অন্তরাত্মা হইতে একই ধ্বনি আইসে যে, ভাবী জীবনের জন্য। একজন নয়, দুইজন নয়, সমস্ত দেশের সমস্ত জ্ঞানী, সমস্ত কর্ম্মী ও সমস্ত বিশ্বাসীর আত্মা হইতে এই একই উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দেশই যেন একমাত্র আশা পূর্ণ হইবার স্থান ও চরম কৃতার্থতার একমাত্র ভূমি। তথায় যাইবার সময় আসিলে, আপন প্রকৃতিই মৃত্যু-দূত সাজিয়া জীবকে নিয়া ভব-সমুদ্রের পারে দাঁড় করে, তারপর তথা হইতে জানি না কোন্ দৈবীশক্তি বা স্বর্গদূত আসিয়া দেহ-চ্যুত অমর আত্মাকে কোন দিব্যধামে লইয়া যায়। যাহাহউক, আমাদের অত্যাদরের দেবী মুক্তকেশীও ধীরে ধীরে কাতর হইতে হইতে একেবারে সেই মহাসমুদ্রের তটে যাইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। ৩২ শে শ্রাবণ সংক্রান্তি দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময়ে সমুদায় শারীরিক শক্তি অবসন্না হইয়া ঘন শ্বাস

বহিতে লাগিল। তখন চিকিৎসকগণ বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন। পতি ও পিত্রাদি সুহৃদ্‌গণ দেবীকে সেই রুগ্ন-শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া ক্ষুদ্র বাসভবন হইতে প্রমুক্ত ও অনন্ত-প্রসারিত আকাশ-প্রাঙ্গনের অন্তিম শয্যায় আনিয়া শয়ান করাইলেন। তখন সেই চরমের আশ্রয় ও অন্তিমকালের ধন হরির ডাক পড়িল। পিতা "ওঁ নারায়ণঃ ওঁ নারায়ণঃ" এই নামামৃত বারবার কর্ণপথে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পতি স্থিরভাবে ধীরমনে নিকটে বসিয়া সেই আত্মার আত্মা ও চরমের সহায় প্রভু পরমেশ্বরকেই ডাকিয়া তচ্চরণে পুণ্যময়ী প্রিয়তমাকে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। মাত্রাদি স্নেহকারী সুহৃদ্‌গণ মুখে একে একে অমৃত-বিন্দু প্রদান করিয়া হরি হরি বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত অভয়বাবুও সময়োচিত গাম্ভীর্য্যতা লইয়া পার্শ্বে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে একেবারেই অন্তিমকাল উপস্থিত, ক্রমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্থির হইয়া সকলকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, "আর তোমরা কি দেখিতেছ? এই যে বিমান-পথে একটী পুণ্যের প্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেল।" এই প্রয়াণ—এই ঊর্দ্ধ-গতি অবশ্যই সামান্য-চক্ষু লক্ষ্য করিতে পারিল না, কিন্তু ভাবুকের আত্মা বুঝিল, ব্যাপারটী কি হইয়াছে। যিনি বাল্যকাল হইতেই নিয়ত কেবল বিদ্যার চর্চ্চা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও বিবিধ ধর্ম্মপুস্তক হইতে সাধু-লক্ষণ, ভক্ত লক্ষণ, সাধনোপায় ও সতী-ধর্ম্ম লিখিয়া অভ্যাস পূর্ব্বক আত্মাতে বিবিধ ভাব সঞ্চয় করিতেছিলেন, এবং যথাসময়ে পিতার নিকট ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত নিত্য ভগবানের আরাধনা

ও তদনন্তর পিতৃমাতৃ চরণ বন্দনা পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন; আবার ভবিষ্যতে যিনি একটী ধর্ম্মাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া জ্ঞান-বিধৌত অতি শুদ্ধাত্মা স্বীয় জীবন-সহচরকে লইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার আশয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সঞ্চয় করিতেছিলেন; যাঁহার মহাযাত্রার সময়ে চতুঃপার্শ্বে পতি ও মাতাপিত্রাদি গুরুগণের সভা, যে দেবসভার প্রত্যেকেই কেহ হরি, কেহ নারায়ণ, কেহ জগদীশ্বর-নাম পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতেছিলেন; একে তীর্থময় স্থান, তাহাতে চতুর্দ্দিকে গুরু-মণ্ডলী ও অনবরত নামকীর্ত্তন, শিরঃস্থানে সন্নিবেশিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সকল শোভমান, এমন তীর্থীভূত দৃশ্যের মধ্য হইতে যাঁহার প্রয়াণ, ঈদৃশী পুণ্যশীলা ও শুদ্ধাত্মা নারীর শেষ গতি কিরূপ হইল, তাহা অতি সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। যাহাহউক, সেই দৃশ্য ও সেই অব্যক্ত-গতির পূর্ব্বাভাস মাত্রই আমি এস্থলে বিবৃত করিলাম। ভাব-বাদীগণ ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন। সেই স্বর্গারোহণ ও সেই দেবলোকে উন্নয়ন কিরূপ, তাহা শুদ্ধাত্মা যোগ চক্ষুঃ ব্যক্তিগণই লক্ষ্য করিতে পারেন।

অতঃপর পিতা দেখিলেন, তাঁহার শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনার পরম সহায় একটী জ্যোতিঃ আকাশে প্রবেশ করিল। গুণবান্ ও স্নেহমমতার নিধান স্বামী দেখিলেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী, ধর্ম্মকর্ম্মের পরম সহায় ও আশার একটী উজ্জ্বল দীপ হটাৎ নিবিয়া গেল। দুঃখিনী গর্ভধারিণী মাতা দেখিলেন, তাঁহার জীবনের নিত্য সাহায্যকারিণী লক্ষ্মী ভাবী জীবনের সাহায্য বন্ধ করিয়া

চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান হইলেন। আর অপর বন্ধুবান্ধব এই তিনেরই একটী অপূর্ব্ব সম্বল গেল ভাবিয়া মুখ বিষণ্ণ করিলেন। কিন্তু বৃথা দুঃখ, কালের নিয়তি কাহারও মুখ তাকায় না ও বুকের বেদনা পরিগ্রহ করিতে চায় না; সকল চেষ্টা ও সকল উদ্যোগ বিফল করিয়া নিয়তির বিধানই পূর্ণ হইল। তখন আর কি, বিপদের চরম-সীমায় দাঁড়াইলে দুঃখও পলায়ন করে; সুহৃদ্‌গণ তখন তৎকালোচিত বিধানানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মৃত্যুর পর মুক্তকেশীর মুখে অতি সুন্দর হাস্য প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার তাৎকালিক দিব্যলাবণ্যময়ী মূর্ত্তির একটী প্রতিকৃতি রাখিতে স্বামীর বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত চিত্রকর অভাবে তাহা আর পূর্ণ হইল না। এখন পিতা সেই সতীলক্ষ্মীকে একখানা অতি সুন্দর সাড়ী পরিধান করাইয়া কপালে একটী সিন্দূরের ফোঁটা ও তদুপরি হরিনাম, কণ্ঠে নারায়ণ-নাম ও দক্ষিণ বাহুতে পতির নাম অঙ্কিত করিয়া দুইস্কন্ধে সুদীর্ঘ মুক্ত-কেশ-রাজী বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। তাহার পর বিবাহের উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বশরীর সমাচ্ছাদিত হইল। তদনন্তর পণ্ডিত-শিষ্য স্কুলের ছাত্রবর্গ তাঁহারই আদেশ ক্রমে রাশীকৃত পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও কয়খানা নামের নিশান আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন পিতা স্বহস্তে গলে ও শীর্ষদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া তদুপরি পুষ্প-বর্ষণ করিলে দেবী বিপ্রগণবাহিত ও দিব্য-পতাকা শোভিত পুষ্প যানে যজ্ঞ-ভূমিতে চলিলেন। পতি সেই ভবানী-পতির ন্যায় ক্ষুব্ধ-চিত্ত হইয়া ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রিয়তমা পত্নীর

পবিত্র দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। আর পিতা সেই বিদ্যাধরী কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে তাঁহার স্বর্গগমনের সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। স্কুলের ছাত্রগণ ও উপস্থিত অন্যান্য সকলে নীরব ও নিস্পন্দভাবে তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আর একজন ভাগ্যবান্ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকের স্ত্রী সেই পুষ্প রথে নীতা সতীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম করিয়াছিলেন; ইহাও দেবীর তৎকালোচিত আর একটী সৎকার বটে। তৎপর সেই শ্মশান-বন্ধু বিপ্রগণ ধীরে ধীরে চলিয়া একটী নির্জ্জন প্রদেশে এক কদম্ব বৃক্ষের নীচে, যেখানে দুই দিবস পূর্ব্বে মুক্তকেশীর প্রিয়তম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথকে দাহ করা হইয়াছিল, তথায় শবাসন স্থাপন করিলেন। তৎপর অচিরেই অনুচরগণ যজ্ঞকুণ্ড খনন ও যজ্ঞীয় কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত করিয়া দিল। এই সময়ে সতীর অনন্ত-জীবনের সুহৃদ্ প্রিয়পতি মন্ত্রযোগে নানা তীর্থবারি স্মরণ পূর্ব্বক সেই প্রেম পূত দেহের অভিষেক করিলেন, এবং তৎসন্নিধানে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক জীবন-সহচরীর সদ্গতির জন্য সাশ্রুনয়নে ও অতি করুণবাক্যে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা এবং প্রণি-পাত করিলেন। তৎপর পিতা এবং পতি দুইজনে কুণ্ডোপরি মৃত-দেহ বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি ঘৃতাদি সিঞ্চন করিলেন। এইতো এখনই অগ্নি প্রজ্বালিত হইবে, এখনই কত আদরের ও কত যত্নের ধন ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে! পাঠকগণ! এখন একবার মনে করিয়া দেখুন, এই দেহের কোথায় কি ভাবে আরম্ভ, আর কোথায় অবসান হইতেছে। যেন বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ত্রিলোক

(পিতা, মাতা ও পতি-হৃদয়) পবিত্র করিয়া এক অতি গভীর মহাহ্রদে যাইয়া মিশিতেছে। কি আশ্চর্য্য! শ্মশানে উঠিয়াও দেবী হাস্য হাস্য মুখে সকলকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অঙ্গের দিব্যলাবণ্য ও পবিত্র মুখ-কান্তি পতি ও পিতা দুইজনেই বার বার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। হায় হায়! যে মূর্ত্তি বহুদিন নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পার নাই, তাহা কি আর এই মুহূর্ত্তকাল দেখিয়া তৃপ্ত হইবে? হায় তবু মায়া-মুগ্ধ চিত্ত বলে, দেখ, দেখ, আবার দেখ! এই যে তোমাদের অতি আদরের ধন সোণার প্রতিমা জন্মের মত লুকাইতেছে। কিন্তু হায়! বলিলে কি হইবে, এই ক্ষেত্রেও দেখিতে দেখিতে শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত, মুক্তকেশীর রোরুদ্যমান "প্রাণেশ্বর" বিগলিত-প্রাণে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জ্বলিত পঞ্চ শলাকা ধারণ করিলেন। অতঃপর কি হইল, পাঠক! তুমি চক্ষুঃ মুদিয়া পাঠ কর।

এইক্ষণে আমি কিঞ্চিৎ দেব-লীলা বর্ণন করি। এই সময়ে পুণ্যময়ী দেবী মুক্তকেশীর যজ্ঞ-কুণ্ডে আহ্বান মাত্রেই দেবপুরো-হিত বৈশ্বানর মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত। তিনি এই পাঞ্চভৌতিক যজ্ঞের হবির্ভাগ দেবগণে বিভাগ করিয়া দিতে লাগিলেন। রূপ অতি সূক্ষ্ম ও তরল করিয়া সূর্য্যালোকে, রস বাষ্প করিয়া আকাশে সঞ্চরমান বরুণদেবে, ও গন্ধ অনিলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আর অবশিষ্ট অগ্নি-দত্ত যজ্ঞ-ভাগ পৃথিবী আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ এই দেবদলকে বার বার প্রণাম করুন। একদিন ইহাঁদিগকে সকলেরই আত্মদান করিতে হইবে। অতঃপর

সমস্ত দেবকোলাহল মিটিয়া গেলে সেই মহাশ্মশানে তমোমূর্ত্তি মহাকাল আসিয়া উপস্থিত; সকলে করযুড়ে এই রুদ্রদেবকেও নমস্কার করুন। এই মহাকালের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে; সমস্ত মায়িক জগৎ ইহাঁরই উদরে প্রবিষ্ট। যাঁহার চক্ষু আছে, ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্রের রূপক উদ্ঘাটন করিয়া একবার দেখুন; কত রাজা, কত রাণী, কত বীর, কত জ্ঞানী, কত পণ্ডিত ও কত প্রেমিক এই ভূতনাথ সময়ের জঠরে ভস্মীভূত। আমাদের এই বহু আদরের ধন সতী মুক্তকেশীরও মায়িক জীবন অদ্য এই যোগীবর মহাকালের যোগাসনের নীচে সমাহিত হইল। সকলে এই সময়ে একবার চাঁদবদনে হরি হরি বলুন।

স্বর্গীয়া দেবী মুক্তকেশীর চরিতামৃত।

শান্তি ও পুণ্যপ্রবাহ।

অন্ত্যেষ্টির পর শোকার্ত্ত জনক জননী ও একান্ত বিয়োগবিধুর স্বামী এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গ স্নান করিয়া শরীরের অস্পৃশ্যত্ব দূর করিলেন। ভৃত্য গৃহাদি শোধন ও দ্রব্যাদি প্রক্ষালন করিয়া দিল। তৎপর সমস্ত সুহৃদ্ একত্র উপবেশন করিয়া পরস্পরের সন্তপ্ত হৃদয়ে কোমল স্নেহ-চামর দোলাইয়া দোলাইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। ইহাই শান্তির প্রথম ক্রিয়া ও সর্ব্বাদৌ অনুষ্ঠান। এই সময়ের ভাব বড় হৃদয়-স্পর্শী ও দৃশ্য অত্যন্ত গম্ভীর। কাহারও মুখে হাসি নাই, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস নাই, চিত্তে

আবেগ নাই, অন্তর বাহির সকলই যেন নীরব ও নিস্পন্দ থাকিয়া সময়ের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। পিতার বড় পিপাসা, তিনি ব্যগ্র হইয়া কতকগুলি সরবৎ পান করিলেন। পতির ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই; মাতারও তথা। কিন্তু তিনি এই শান্তির সময়েও থাকিয়া থাকিয়া একটুকু একটুকু ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মায়াময় প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। আর অতি শান্ত, ধীর ও প্রজ্ঞাবান্ অভয়বাবু সকলের উপর বিবিধ বিধানে স্নেহ মমতা বিকীরণ করিতেছিলেন। এই ভাবেই দিন গেল, এবং রাত্রি আসিল; রজনী-মুখে সকলেই এক গৃহে পরস্পরের উপর দৃষ্টি করিতে পারেন, এমন ভাবে শয্যা আশ্রয় করিলেন। ইহাও শান্তির এক অপূর্ব্ব নিবাস; এই শয়নাধারে নিভৃতভাবে শরীর প্যাতিত করিয়া বিবেক ও বৈরাগ্য সহকারে ধীরে ধীরে ঈশ্বর-স্মরণ বড়ই শান্তি প্রদ। যাহা হউক, এই সময়ে রজনীর অন্ধকার শোকের অন্ধকারে মিশিয়া আরও ঘনীভূত হইল, এবং তাহাতে সেই অতিক্রান্ত অষ্টাহের ক্লান্তি আসিয়া যোগ দিল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাও তখন আসিলেন। তৎকালে থাকিয়া থাকিয়া শোকের নিশ্বাস না বহিলে, ইহা নিশ্চয় মৃত্যুরই প্রতিকৃতি বলিয়া আমরা স্থির করিতাম। এইরূপে সেই অর্দ্ধনিদ্রা বা তন্দ্রার অবস্থাতেই রজনী প্রভাতা হইল। তুমি সুখে থাক আর দুঃখেই থাক, মনে রাখিও কালচক্র, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে অবস্থান্তরে লইয়া যাইবে। তুমি শান্তিময়ী রজনীর ক্রোড়ে সর্ব্বাঙ্গ মিশাইয়াও যদি নিদ্রা যাও, তবু সময়ে তোমাকে ছাড়িবে না, জাগাইয়া

তাহার কার্য্য সে সাধন করিবে। সময়ের মতন পরিবর্ত্তন-শীল সান্ত্বনাকারী সুহৃদ্ আর নাই। প্রকৃতপক্ষে লোক সময়ের ক্রীড়া-পুত্তল, সময়ই লোককে কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন নৃত্যে প্রবর্ত্তিত করে, আবার কখন বিগলিত-প্রাণে শোকতাপ করিতেও ইঙ্গিত করে। এই বিচিত্র সময়ের বিধানেই জননী আবার জাগিয়া শূন্যাগার দৃষ্টে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন —সেই ফুৎকারে তখন সকলের হৃদয় কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত ও ধূমায়-মান হইয়া উঠিল; নির্ব্বাপিত দুঃখ পুনরুদ্দীপিত হইল। এই সময়ে জ্ঞানী অবশ্য বলিতে পারেন, শোকের আবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতি ঘটাইতেছে, তাহাতে আমরা কেন বৃথা শোক তাপ করিয়া ক্লেশানুভব করি? কিন্তু প্রেমিকের আত্মা তাহাতে সায় দেয় না, হৃদয়ের প্রেম-তৃষ্ণা বলে, আমি পরিতৃপ্ত হই নাই, আমার ক্রীড়ার সামগ্রী বিস্মৃতির সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলে চলিবে না; পুনঃপুনঃ ইহার স্মরণ ও খাঁটিরূপে মনন করিয়া আমাকে সন্তৃপ্ত কর। অবশ্য এরূপ প্রার্থনা বা বিধান প্রেমিকের হৃদয় হইতে উত্থিত হইতে পারে; এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও উক্তরূপ উচ্চতর স্বাভিমত অভি-ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ধীমানের কর্ত্তব্য কি? তিনি কি কেবল আত্ম-রুচির সমর্থন বা আত্মোত্থিত যুক্তি তর্কের মীমাংসা করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন? তাঁহার উচিত, সেই সদ্‌বুদ্ধি-শালী প্রকৃত মনস্বী লোকের একান্ত কর্ত্তব্য যে, তিনি এই সময়ে স্বীয় প্রেমাস্পদকে লইয়া শ্রেয়ের পথে অমৃত-সদনে ভগবানের নিকটে নিয়ত উপস্থিত থাকেন,

যেখানে শোক নাই, পরিতাপ ও নিরাশার প্রদাহন নাই, যথায় কেবলই মিলন ও কেবলই উত্তরোত্তর উপশম। জ্ঞানীর জ্ঞান ও প্রেমিকের প্রেম উভয়ই সেখানে যুগপৎ চরিতার্থ হয়। যাহা হউক, এই স্থলে আমাদের পুণ্যশীলা স্বর্গগতা দেবীর স্বকীয় পুণ্য-বলেই তিনি তাঁহার পৃথিবীস্থ সুহৃদ্‌দিগকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তদবস্থাতেই একদিন একদিন করিয়া সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল; চতুর্থ দিবসে পিতা স্বীয় শোকাতুরা পত্নী, জ্ঞানবান্ জামাতা ও মৃত কন্যাপুত্রের শুশ্রূষাকারী অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে লইয়া স্বভবনে বিশ্বপতির অর্চ্চনা ও মৃত সন্তান দুইটীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তিনি বিবিধোপকরণ-সমন্বিত দুইটী ভোজ্য উপরোক্ত সন্তানদ্বয়ের স্বর্গার্থ দান করেন। মাতা অতি শ্রদ্ধাবিষ্টা হইয়া কয়টী ব্রাহ্মণের সেবা দেন, এবং অপর কাকাদি অন্নভুক্ প্রাণীদিগকেও কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করা হয়। ইহা করিয়াও বোধ হয় প্রাণের আবেগ নিবৃত্ত হইল না, হৃদয় যেন লুক্কায়িতভাবে আরও এমন কিছু প্রেরণ করিতে চায়, যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই পরলোকগত সন্তানদ্বয়ের তৃপ্তিসাধন করে। এই আন্তরিক প্রেরণা বা আধ্যাত্মিক যোগবশতঃই মাতা ইতিমধ্যে এক দিবস স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, যোগেন্দ্র আসিয়া বলিতেছে “মা! আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমাকে কিছু জল দেও।” এই সকরুণ প্রার্থনাতে মাতাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল, তিনি পর দিবস স্বীয় ভর্ত্তার নিকটে রোদন করিতে করিতে এই সংবাদটী কহিলেন। পিতা তদ্দিবস অপরাহ্ণেই কিঞ্চিৎ ফল সন্দেশ ও শীতল পানীয় সাক্ষাতে

আহরণ পূর্ব্বক স্বীয় জীবনানুকূল বন্ধুদিগকে লইয়া যোগেন্দ্রের পারলৌকিক তৃপ্তির জন্য সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও প্রণিপাত করিয়া উপস্থিত বন্ধুদিগকে সেই ভোজ্য ও পানীয় শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করেন। আপাততঃ ইহাতেই মাতার কথঞ্চিৎ আন্তরিক উপশম হয়।

শরৎ বাবুর স্বীয় সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ পুষ্পচয়ন করিয়া প্রিয়তমার শ্মশান-ভূমিতে গমন করিতেন, এবং তদুপরি তাহা বর্ষণ করিয়া সাশ্রুনয়নে ও বিগলিত হৃদয়ে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা, প্রণিপাত ও আত্ম-নিবেদন করিতেন। কোন কোন দিন পরম সুহৃদ্ বাবু দীননাথ দাসও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। শরৎ বাবু অতি সুধীর লোক, এই যে সর্ব্বনাশ হই-য়াছে, এই যে একটী সোণার প্রতিমা, আদরের জায়া ও জীবনের এক অপূর্ব্বধন জন্মের মত হারাইয়া ফেলিয়াছেন, জীবনের ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত, তথাপি অতি প্রশান্ত-চিত্তে ও যেন নিতান্ত অক্লিষ্টভাবে একে একে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। তিনি দশাহে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পারে শুক্লেশ্বরের ঘাটে যাইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত রীতিমত পূরক-পিণ্ড প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ক্ষীর ও নীর প্রদানের মন্ত্রগুলি বড়ই ভাবময় ও চিত্তাবসাদক। প্রাচীন বিধানের প্রতি ইহাঁর একান্ত শ্রদ্ধা, এই জন্যই ইনি একাদশাহে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে অশ্বক্রান্ত তীর্থে যাইয়া যথাশাস্ত্র দানাদি শ্রাদ্ধক্রিয়া করেন ও সেই তীর্থ-বাসী বিপ্রবর্গকে ভোজন করান; এবং তাহার পরদিবসেও যাহা যাহা করণীয় ছিল, তৎসমুদায় সম্পাদন করিয়া

তথায় কয়েক দিবস অবস্থান পূর্ব্বক পুঁঠিয়ায় প্রস্থান করেন। এই বিদায় ও এই প্রস্থান বড়ই শোকাবহ ঘটনা; একটী অতি সদাত্মা পুরুষ যেন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শূন্য-হৃদয়ে নিরাশার রাজ্যে যাইতেছেন। হায় হায়! মুক্তকেশীর "প্রাণেশ্বর!" তুমি কি লইয়া জাহাজে উঠিতেছ? তোমার ঐ হস্ত-স্থিত ঝুলিতে কি? তুমি প্রিয়তমার এই অস্থি ও ভস্ম নিয়া কি করিবে? এই বাক্স পূর্ণ করিয়া তুমি কাহার পুস্তক-রাশি লইয়া যাইতেছ? আর এই যে পরিত্যক্ত বসন ভূষণ কয়খানা, ইহাই বা তুমি কিজন্য কুড়াইয়া লইয়া যাও? হা বাছা! তোমার মুখ কেন এত বিষণ্ণ? সত্য সত্যই তুমি কিছু হারাইয়া যাইতেছ নাকি? তোমার মুখ দেখিয়া যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! একবার তীরের দিকে ফিরিয়া চাও, দেখ তোমাকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়া ঐ অন্ধকারের মধ্যে কে তোমার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! আর দেখ ঐ যে শ্মশান-তুল্য শোভাহীন শূন্যাগার, সেখানে বসিয়া আর একটী দুঃখিনী তোমার জন্য কেমন ব্যাকুল হইয়াই রোদন করিতেছেন! বাস্তবিক তন্মুহূর্ত্তে শ্বশুর শ্বাশুড়ী দুইজনেই অতি খিদ্যমান হইয়াছিলেন। এমন কি, বিদায়-সময়ে জামাতার মুখের দিকে তাকাইতেই ইহাঁদের হৃদয় ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আহা কত আশা ও সুখের কল্পনা এক ঝঞ্ঝাবাতেই উড়িয়া গেল!

সাধারণতঃ সকলে ভাবিতে পারেন যে, এইখানেই মুক্তকেশীর জীবনী নিঃশেষিত হইল, তাঁহার আর কোন শক্তিই এ পৃথিবীতে রহিল না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; তিনি স্বয়ং চলিয়া গেলেও তাহার পুণ্য-প্রবাহ ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা অন্তঃ-

সলিলা নদীর ন্যায় পতি ও পিত্রাদি সুহৃদ্‌গণের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দিয়া বহিতে থাকিল। আমরা মনে করি, এই অন্তর্ব্বাহিনী দেব-নদীর তিনিই উৎস ও তিনিই প্রবর্ত্তিকা। কে বলিবে, কতদিন এই অন্তঃপ্রবাহ ও ভাবের স্রোতঃ এই মরুস্থল দিয়া বহিয়া যাইবে!

পিতা মনে করিলেন, তিনি মর্ত্ত্যে থাকিয়াই স্বর্গীয়া কন্যার সহিত যোগ রক্ষা করিবেন। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহারই শান্তি কামনা করিতে করিতে ব্রহ্ম-পদে যাইয়া প্রণত হৃদয়ে আরাম উপভোগ করিবেন। পাঠক তবে এইক্ষণে একবার মনে করিয়া দেখুন, যদি সত্য সত্যই জীবনের অন্তর্ব্বাহিনী শক্তি বা ভাবের স্রোতঃ শুকাইয়া না যায়, ও নিরন্তর আত্মার ভিতর দিয়া বহিতে থাকে, তবে কন্যার এই অকাল মৃত্যুই পিতার কেমন সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! তিনি কিয়দ্দিন গৌহাটী অবস্থানের পরেই আবার অবশিষ্ট সমস্ত পরিজন লইয়া কাছাড় প্রস্থান করেন, এবং তথায় যাইয়া অচিরে মুক্তকেশীর নামে একটী ক্ষুদ্র দেবালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় স্বীয় প্রেমাস্পদ সন্তানত্রয় মুক্তকেশী, হিরণ্য-প্রভা ও যোগেন্দ্রনাথের তিনটী সমাধি-বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ইহাকেই ধর্ম্মকর্ম্মের এক অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া আত্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বেদীত্রয় প্রতিদিনই পুষ্পরাজীতে সজ্জিত ও সমাদৃত হইতেছে, এবং কোন কোন দিবস সায়ংসময়ে একটী বেদী হইতে দীপালোক ও অপরটী হইতে ধূপগন্ধ উদ্গত হইয়া পিতার অন্তরের সদ্ভাব বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আর মধ্যস্থিত প্রধান বেদীর উপরে

সংরক্ষিত পাঠ্য ধর্ম্মপুস্তক পিতার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে অনেক সময়েই পুণ্যগন্ধ ও ধর্ম্মালোক প্রদান করিয়া থাকে। এইক্ষণে যে স্থানে মুক্তকেশীর সমাধি-বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানটীতেই পতি-পত্নীর প্রথম মিলন ও শুভ পরিণয় সম্পাদিত হয়। সেই আনন্দ ভূমিই এখন তাঁহার শ্মশানের প্রতিনিধি সমাধিস্থান হইল। পাঠক মহাশয় এইখানেও একবার আনন্দ মনে ভাগ্যবতী মুক্তকেশীব স্বর্গার্থ হরি হরি বলুন।

কাছাড়ে সেই স্বর্গীয়া দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মালয়ে পরোল্লিখিত শ্লোকত্রয় লিখিত রহিয়াছে। তৎপাঠে দেবীর জীবন-মাহাত্ম্য পাঠক মহাশয় সংক্ষেপে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১২৯৫ বাং পৌষ।

পীতং পীতং ক্ষরিতমমৃতং ভক্তিশাস্ত্রাৎ সুতত্ত্বম্
নীতং নীতং শিরসিচ যয়া স্বাদরৈর্জ্ঞান কোষং।
ইত্থং নিত্যং মনসিবহুলং তস্য সঞ্চিত্যসারং
ধন্যা পুণ্যা স্বপদমমলং সাগতা ব্রহ্মধাম ॥ ১ ॥
সাসীৎপুণ্যবতী নারী বিদুষী ধর্ম্মতৎপরা।
পতিপ্রাণা মহাভাগা পিতৃমাতৃবশানুগা ॥ ২ ॥
তস্যাঃ পুণ্যস্মৃতের্ন্যূনং স্ফুরণায় বিনির্ম্মিতঃ।
এষ দেবালয়ো যত্র কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

যাহাদ্বারা ভক্তি শাস্ত্র হইতে ক্ষরিত উত্তম তত্ত্বামৃত বার বার পীত এবং শীর্ষস্থ জ্ঞান-ভাণ্ডারে অতি সমাদরে পুনঃপুনঃ নীত হইয়াছে। এই প্রকারে নিত্য বহুল পরিমাণে মনোমধ্যে সেই

তত্ত্বসার সঞ্চয় করিয়া সেই সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়া পুণ্যময়ী স্বকীয় নির্ম্মল আশ্রয় স্থান ব্রহ্মপুরে গমন করিয়াছেন। সেই মহাভাগ্যবতী পুণ্যময়ী বিদুষী ধার্ম্মিকা নারী পতিগতপ্রাণা, পিতৃ মাতৃবশবর্ত্তিনী, এবং তদনুগতা ছিলেন। তাঁহারই পুণ্য-জনিকা স্মৃতির বিস্ফুরণ নিমিত্ত এই দেবালয় নির্ম্মিত হইল, যে স্থানে হরি সতত কীর্ত্তনীয়।

এদিকে মুক্তকেশীর পিতামাতা চলিয়া আসিলে গৌহাটীতেও তাঁহার জীবন্ত-স্মৃতি, স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থায় সুহৃদ্‌বর্গের চিত্ত-বৃত্তির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। মুক্তকেশীর পিতৃ সম্পর্কে একটী ধর্ম্ম-ভগিনী (স্বর্ণময়ী দেবী) কিয়দ্দিবস পর মুক্তকেশীর পিতা মহাশয়কে একখানা পত্র লিখেন। সেই পত্রাংশ এই ;—

"মুক্তকেশীকে আমি ভুলিতে পারি না, আপনার উপাসনা কোঠার দিকে দৃষ্টি করিলেই যেন সে আমার চক্ষে ভাসে। অনেক রাত্রির পর সেই কোঠায় মুক্তকেশী পড়িতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর যেন আমার কর্ণে বাজে। এইতো দিন অবসান হইয়া আসিতেছে, এই সময় আপনি যে উঠানে আসন পাতিয়া স্বর্ণ, মুক্ত, চারু ও যোগুকে চারিদিকে নিয়া পড়াইতে বসিতেন ; আমি এখনও সুবিধা পাইলে এই সময়ে ঐ স্থানটী প্রদক্ষিণ করি, অথবা ঘরে থাকিয়াই নিরীক্ষণ করিয়া দেখি। সেই সরস্বতী-মূর্ত্তি মুক্তকেশী কোন কোন দিন মুক্তকেশেই এই স্থানে বসিতেন, আবার কোন দিন বেণী বাঁধাও দেখিতাম। আর একটী কথা বলি শুনুন, গত মাঘ মাসে একদিন সায়ংসময়ে আমি ঘরের পাছে হাত পা ধুইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যেন

মুক্তকেশী আমার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তৎপর যেই আমি চকিত হইয়া তাকাইলাম, আর কিছুই দেখিলাম না।”

তাহার কিয়দ্দিন পর অতি ভাবপ্রবণ ও পবিত্র স্নেহমমতার নিধান শ্রীযুক্ত অভয়বাবু মুক্তকেশীর পিতাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আপনার কোঠায় মুক্তকেশী যেখানে বসিয়া ভাগবত পড়িত, তথায় আমরা সকলে একদিন ভগবানের পূজা করিলাম ও ভাবযোগে সকলকেই দর্শন করিলাম, এবং সেই মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া অমৃতরস পাইলাম। হা, ঠাকুরের বড় দয়া!”

হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া সিদ্ধান্ত করিলে বুদ্ধিমান্ অবশ্যই বলিবেন, এ সকল শ্রীহরির জীবন্ত প্রেম-লীলা। অতি সমাদরে বসিবার স্থান প্রদক্ষিণ, মৃত্তিকা চুম্বন ও দিবসে স্বপ্নবৎ দর্শন, এই সকল নিশ্চয়ই হৃদ্গত ভালবাসার জীবন্ত প্রতিক্রিয়া। ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত প্রেম এই জগতের উপর কত ভাবে নৃত্য করে, এস্থলে তাহাই সম্যক্ অবলোকনীয়।

আবার অপরদিকে কি হইতেছে, পাঠক একবার মনোনিবেশ করুন। সংসার-তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ ও বিষয়-বিবেকী পতি ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আবার অন্যরূপ অভিনয়ে প্রবৃত্ত। ইনি নাকি মৃত পত্নীর ভস্মাবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি নিচয়দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মালাতে ব্রহ্মমন্ত্র জপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে সন্দোহন করিবেন। হা ধন্য সাধুর বাসনা! ধন্য প্রেম! এইরূপ দৃশ্য কাব্যোল্লেখিত কন্দর্প-পত্নীর প্রেম ক্রিয়া হইতেও সুন্দর, সেই সতীর পতি-ভস্ম তাঁহার নিজ গাত্রকেই শোভিত করিয়াছিল, আর এই স্থলে এই প্রেমমালা প্রেমিকবরকে শোভিত করিয়াও

অক্ষরে অক্ষরে ভগবান্‌কে স্পর্শ করিবে ও সেই তৃষিত আত্মাতে অমৃত আনিয়া দিবে। হয়তো দেবী জীবিতা থাকিয়াও যে কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না, এই সামান্য অস্থি-খণ্ডগুলিতে তাহা করিবে। অসম্ভব নয়, হয়ত এই পবিত্র-জপ-মালাই স্বর্গে মর্ত্যে ছায়া-পথ নির্ম্মাণ করিবে ও জীবে পরমে সংযোগ করিয়া দিবে, এবং প্রাণের মধ্যে নিরন্তর সেই দুর্লভ শ্রীধর-পাদ-পদ্মের স্ফুরণ করিবে।

হে সুব্রত! মুক্তকেশীর প্রেমমোহিত সজ্জন! আপনি সাধু-জন-প্রশংসিত শ্রেয়ের পথেই অধিরূঢ় হইয়াছেন। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন কেহই এত অনায়াসে এই মুক্তিমার্গ লাভ করিতে পারেন নাই। আপনি অবগত হউন, স্বর্গগতা বিদ্যাধরী আপনার সহধর্ম্মিণী দেবী মুক্তকেশী তদীয় শ্লোক-সংগ্রহে এই শ্লোকটীও (বোধ হয় আপনারই জন্য মনোনীত করিয়া) রাখিয়া গিয়াছেন ;—

"ব্রাহ্মণস্য হি দেহোয়ং ক্ষুদ্রকামায়নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসেচেহ প্রেত্যানন্ত সুখায় চ॥"

ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র বিষয়-কাম সম্ভোগ করিবার জন্য বাঞ্ছিত নহে; ইহলোকে কৃচ্ছ্র তপস্যা ও পরলোকে অনন্ত সুখই এই দেহ ধারণের উদ্দেশ্য। আপনি নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত হউন, ঈশ্বরের পুণ্যালয়ে আপনার জন্য অনন্ত সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে। সম্প্রতি আপনার চক্ষুর নিকট হইতে চপলার ন্যায় যে জ্যোতিটী স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গেল, তাহা কেবল আপনারই পথ প্রদর্শন ও মন প্রাণ আকর্ষণ করিবার জন্য। আরও বলি এই ঘটনাতে আপনাকে আপনি দুর্ভাগ্য মনে করিবেন না; ভোগ-সুখের

রাহিত্যই যদি দুর্ভাগ্য হয়, তবে অস্মদ্দেশীয় তাপসকুলই নিরতিশয় ভাগ্য-বিবর্জ্জিত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা নয়, এই স্থূল ভাগ্য অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আর একপ্রকার নিৰ্ম্মল ভোগ ও নিত্য সুখ আছে, তাহাই ভবাদৃশ সদাত্মাগণের অন্বেষ-তব্য। বুঝিতে হইবে, এই দেহ অবশ্যই নশ্বর ও নিতান্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর; ইহা অতি যত্নে রক্ষা করিলেও অভগ্ন থাকে না। কিন্তু তিনিই ধন্য, তাঁহারই দেহ ধারণ সার্থক, যাঁহার এই অচির দেহের অকিঞ্চিৎকর নিদর্শন বা তাহারই প্রক্রিয়া দ্বারা চিরস্থায়ীরূপে ভগবান্‌কে ধরিতে পারা যায়! আর তিনিও ধন্য, যাঁহার মনো-বৃত্তি সকল প্রিয়বস্তু সহযোগে অন্তর্মুখী হইয়া সহজেই ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, এবং সৌভাগ্য যাঁহার জপতপের ভিতর দিয়া গোপনে দেব দুর্লভ ধন আনিয়া দেয়! বাস্তবিক ইহাই সাধনার প্রকৃত সিদ্ধি ও কৃতার্থতার অমোঘ উপায়। আপনি আশ্বস্ত হউন, আপনি যে পথে চলিয়াছেন ভগবান্ আপনাকে কৃতার্থ করিবেন।

এই ভাগ্যবান্ পুরুষ মুক্তকেশীর "প্রাণেশ্বর" এইক্ষণে অতি দীনভাবে জীবন যাপন ও প্রতিদিন ভক্তির সহিত নীরবে প্রেমাশ্রু দিয়া ভগবানের পূজা করাই পরমধৰ্ম্ম মানিয়া লইয়াছেন। ইঁহার দাম্পত্য-প্রেম ও পারত্রিক বিশ্বাস অতি উচ্চতর রকমের, বন্ধু-বান্ধবের বহু অনুরোধ ও বহু অশ্রুবর্ষণেও এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই প্রেমব্রত ভঙ্গ করিতে পারে নাই; তিনি তাঁহার প্রেমময়ীর সঙ্গে অনন্ত জীবনের জন্যই বাঁধা আছেন, এইরূপ বিশ্বাস করেন। এ অতি উত্তম কল্প, সাধ্বী নারীকুল যদি ভর্ত্তার মৃত্যুতে পবিত্র

ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন পুনর্মিলনের আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতে পারেন, তবে সৎপুরুষেরাই বা কেন সেই পুণ্যব্রত পালন করিতে পারিবেন না? যিনি ধীর, যিনি প্রজ্ঞাবান্ ও একান্ত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, তাঁহার পক্ষে যে সকলই সুসাধ্য; তিনি আপনিই আপনার সুকৃতি ও সুনিপুণ তপঃপ্রভাব গঠন করিয়া লইতে পারেন, তদ্বলে বিহঙ্গ-রূপী দেবদূত হইয়া প্রিয় বস্তুর অন্বেষণার্থ কখন মর্ত্তো ও কখন ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন, এবং সদা বিমুক্ত-বন্ধন হইয়া মনেব আনন্দে চিত্তাকাশে উড়িয়া বেড়ান। কিন্তু ইহা সামান্য কথা নয়, অতি ভাগ্যবানেরাই সেই সর্ব্বদেব-নমস্কৃত পরমহংস-পরিসেবিত বিমান-পথের যাত্রী হইতে পারেন। যাহাহউক আমাদের এই চরিতোল্লিখিত মহাপুরুষের হৃদয়ে সম্প্রতি আর একটী অতি সুমহৎ সঙ্কল্প নিহিত আছে; ইনি অচিরেই স্বীয় প্রণয়িণীর স্মরণার্থ একটী পঞ্চবটী ও পথিক-দিগের শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তথায় একটী পান্থনিবাস স্থাপন করিবেন। এতন্নিমিত্ত একটুকু স্থানও ক্রয় করা হই-য়াছে। ঈশ্বর ইহাঁর এই সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন। সাধ্বী সতীর পুণ্য-প্রবাহ মর্ত্ত্যেও এই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভিতর জীবিত ও প্রবাহিত হইতে থাকুক। আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এবং সাশ্রু-নয়নে অনন্ত জীবনের আশ্রয় [illegible] হরিকে নমস্কার করিয়া এইখানেই স্বর্গগতা [illegible] বিদ্যাধরীর পার্থিব-জীবন-লীলা [illegible] বর্ণনার শেষ করি। পাঠক! এই পূর্ণ-বিরতিতে আপনিও একবার চাঁদ বদনে হরি হরি বলুন
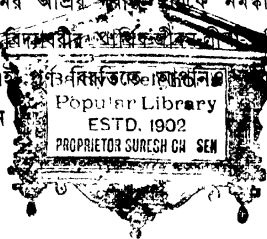
পরিশিষ্ট।

স্বর্গ-বাসিনীর প্রতি সমাদর।

১

কুসুম শুকায়ে গেলে
সুষমা থাকেনা আর ;
মানুষ মরিয়া গেলে
রূপ-শোভা যায় তার।

কুসুম শুকায়ে যায়,
তবু থাকে বাসটুকু ;
মানুষ মরিয়া যায়,
তবু থাকে যশটুকু।

পুণ্যপ্রভা * গেছে চলি,
নাম মাত্র এবে সার ;—
প্রভাটুকু গেছে চলি,
পুণ্যটুকু আছে তাব।

* মৃত্যুর পরে এই নামটী রাখা হইয়াছিল।

আলোক নিবিয়া গেছে
শূন্য করি ত্রিসংসার ;
রূপটুকু নিয়া গেছে
গুণটুকু রেখে তার।

২

কুসুম-কোরকে কীট অকালে পশিল।
কুসুম-সুষমা হায়! অকালে নাশিল।
একটী কুসুম-কলি বিজন কাননে
আছিল ফুটিয়া ;—
একটী কুসুম-কীট পশিয়া গোপনে
ফেলিল কাটিয়া।
কোমল পাপড়িগুলি পড়িল ঝরিয়া,
কুসুম-কলিটী গেল অকালে মরিয়া!!

৩

কুসুম-কলিটী'পরে একটী মধুপ
থাকিত বসিয়া ;—
শোক তাপ যেত ভুলি যখনি বিশ্রাম
লভিত আসিয়া।
বড় সুখে ছিল তারা মিলি দুইজনে
মধুর মিলনে ;—
আলোকিত ছিল হিয়া মধুর প্রেমের
বিমল কিরণে।

কত আশা, কত সাধ, কতই বাসনা
ছিল দুজনার!
হায়, শূন্যে অট্টালিকা হইল তাদের
নিরমাণ সার!!
কুসুম-কলিটি হায়! শুকাইয়া গেল
কাল না পূরিতে;—
বাসটুকু রেখে গেল, প্রাণের অলির
শোক নিবারিতে।
বসিল না আর অলি, অন্যের মতন,
কভু অন্য ফুলে।
পারিজাত ফুলে হায়! বসিয়াছে যে, সে
বসে কি শিমুলে?
গেল আশা, গেল সাধ, গেল সে বাসনা
মিশিয়া হৃদয়ে;—
ভ্রমিতে লাগিল একা উদাস ভ্রমর
শূন্য প্রাণ লয়ে।

৪

ভ্রমরের প্রতি।

এ সংসার দুঃখের আগার
ত্যজিতে হবে সবার।
কি সুখী কি দুঃখী সকলেই
ত্যজিবে পাপ-সংসার॥

ভুলিবে অনন্ত দুখ,
লভিবে বিমল সুখ ;
সেই শান্তিময় পুণ্যধামে
মিলিবে সখে আবার ॥

দিনে দিনে ক্রমে যবে,
আয়ু অস্তমিত হবে,—
সেই শান্তি ধাম দেখা দিবে
নির্ম্মল নভে আবার ॥

হাসিবে অনন্ত তারা
অনন্ত কুসুম-পারা,
সেই অনন্ত গগনে তারা
ভ্রমিবে সুখে আবার ॥

তুমিও—তুমিও অলি
যাইবে—যাইবে চলি
সেই পুণ্যভূমি—দিব্যধামে,—
ত্যজিয়া পাপ সংসার ॥

মিলিয়া কুসুম সনে
অভেদাত্মা দুই জনে,
সেই চির শান্তি নিকেতনে
অবিচ্ছেদে রবে আবার ॥

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন,
পুঁঠিয়া—কান্দরা।

পতিব্রতা পূজনীয়া রমণীগণের মধ্যে পাণ্ডিত্য-পরিপুষ্টা মুক্ত-কেশী দেবী জটাজূটধারী শ্মশানবাসী সদাশিবের প্রাণ-প্রিয়া সতীর ন্যায় গৃহ-সম্পত্তি-বিহীন পূতচিত্ত শরচ্চন্দ্রের শুশ্রূষা ও পোষ্যবর্গের পরিতুষ্টির নিমিত্ত স্বাভাবিক যত্ন ও অধ্যবসায়-বলে রমণীয়তা ও পবিত্রতার যে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও গভীরতা মানব-হস্ত-ধৃত ক্ষুদ্র লেখনীর বর্ণনীয় নহে। সুযোগ্য ভাবুক লেখক বর্ণনায় আত্মশক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও, একজন মনুষ্যে যেমন একটী জীবনের সমুদায় ঘটনার আনুপূর্ব্বিক অভিজ্ঞতা অসম্ভব, সেইরূপ জীবন-চরিত-প্রণয়নেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক আমরা সেই গুণ-সমুদ্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে পঙ্কিল করিতে ইচ্ছা করি না, কেবল তাঁহার জ্ঞান ও তৎপিপাসা-সম্বন্ধীয় স্মৃতিপথে সতত জাগরূক ঘটনাবলীর অংশ-বিশেষ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শরচ্চন্দ্রের পবিত্র হৃদয়ের মহত্ত্ব যখন আমাদিগকে বশীভূত করিতেছিল, সেই সময় দেবী মুক্তকেশী সর্ব্বপ্রথম পুঠিয়ায় পদার্পণ করেন। এই সময় শরচ্চন্দ্রের অবস্থিতি,—স্বীয় পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন মহামনা মহেশচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের ভবনে, এবং কার্য্য,—পুঠিয়া স্কুলের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষকতা। আমি একদা মুক্তকেশীর চিকিৎসার্থ তথায় শরচ্চন্দ্রের সান্নিধ্যলাভ করিয়া, তাহার প্রমুখাৎ বধূবরের নানাবিধ সদ্‌গুণ ও দম্পতীর সন্তোষ-মিশ্র সদ্ভাবের কথা শুনিয়া সমধিক আনন্দ অনুভব করিতে-

ছিলাম এবং তন্নিবন্ধন মনুসংহিতার এই শ্লোকটি

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥"

আমার অন্তরাত্মা যেন যোগ্য অবসর বুঝিয়া উচ্চারণ করাইলেন। ইহার তাৎপর্য্য যেন শরচ্চন্দ্রকে স্বীয় ছন্দানুবর্ত্তিনী বিদুষী পত্নীকে শ্লোকটী উপহার প্রদানের জন্য বাধ্য করিল। তিনি তদাশয়ে সাগ্রহে শ্লোকটি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া পত্নী-সকাশে উপস্থিত হইলেন; সেখানে তাঁহার অবিমিশ্র আনন্দলাভের প্রত্যাশা, কিন্তু কেমন ঘটনা, শ্লোকটির 'ভর্ত্ত্রা' স্থানে 'ভত্ত্রা' লিখিত হইয়াছে, রেফটি দিতে ভুল হইয়াছে। মুক্তকেশী যদিও শ্লোকটি পাইয়া পরিতোষ লাভ করিলেন, তথাপি তিনি লিপিকরের প্রমাদটি প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখী হইলেন না। কাজেই শরচ্চন্দ্রের আশানুরূপ আনন্দলাভ হইল না, লজ্জা তাঁহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিল। কিন্তু এই লজ্জার মধ্যেও তাঁহার যে আনন্দ তাহা অনির্ব্বচনীয়—আশার অতিরিক্ত। পত্নী বা পুত্রের উৎকর্ষ সাধারণ মনুষ্যকেও যখন সুখী করে, তখন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞতর ব্যক্তিকে যে মোদযুক্ত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বালিকার ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম এবং মনে মনে ইহা শরচ্চন্দ্রের পুরাকৃত সুকৃতের ফল বলিয়া মীমাংসা করিলাম। বস্তুতঃ এইরূপ অল্প বয়সে গৃহ-কর্ম্মের সহিত পিতৃ-সন্নিধানে সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা বধূর ব্যাকরণ-জ্ঞানের যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা অনুমানে

প্রবৃত্ত হইলে, ভবিষ্যৎ আশার সীমায় কদাচ উপনীত হইতে পারা যায় না। আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থী এইরূপ অনধীত ব্যাকরণ বালকগণ কদাপি ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে পারগ হইতে পারে না, পরন্তু এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব শ্লোকের অর্থও তাহারা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সতত গৃহ-কর্ম্ম-শিক্ষা-সংলিপ্তা মুক্তকেশী দেবী পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশমাত্র অধ্যয়ন করিয়া, যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহাতে যে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ভাবের উৎপত্তি হইল, তাহার মধ্যেও অধ্যাপকের যোগ্যতার সঙ্গে দেবী মুক্তকেশীর বুদ্ধি-প্রাখর্য্যই সুব্যক্ত রহিয়াছে।

তাঁহার গৃহ-কর্ম্মে যেরূপ দক্ষতা ছিল, তন্মধ্যেও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি পোষ্যবর্গের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন যে, তাঁহার দাস দাসী পাচক প্রভৃতি বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নপ্রকৃতিক ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার দর্শনে, সহসা তাহাদের অবস্থাগত পার্থক্য উপলব্ধি হইত না, প্রত্যুতঃ তাহারা সকলেই যেন কর্ম্মভারকে ক্রীড়ার উপকরণ ভাবিয়া, পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহে সুখের বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছে বলিয়া বোধ হইত। প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলাগণও মুক্তকেশীর স্পৃহনীয় সদ্ব্যবহারে পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে উচ্চ-সম্মান দ্বারা সমাদর করিতেন।

মুক্তকেশীর লজ্জাশীলতায় কৃত্রিমতা ছিল না, আমরা কখনও তাঁহার কণ্ঠ বা কঙ্কণ-ধ্বনিকে সূর্য্যদেবের অরুণের ন্যায় প্রভুর আগমন ঘোষণা করিতে শুনি নাই। একদা শরচ্চন্দ্র ও

মুক্তকেশী উভয়ে জ্বরে আক্রান্ত, আমি ও শরচ্চন্দ্রের শৈশব সহচর বারাণসীস্থিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় তথায় উপস্থিত। শরচ্চন্দ্রের অবস্থা সে দিন আরোগ্যের অনুকূল দেখিয়া, তাঁহার শয্যা-সন্নিহিত কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছি, কিন্তু সেই গৃহের অপর প্রান্তে স্বতন্ত্র শয্যায় শায়িতা মুক্তকেশী দেবী যে আমাদের আগমনের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াই আপাদ মস্তক গুরু-প্রাবরণে আবৃত করিয়া, নির্জ্জীবের মত নিশ্চেষ্টা হইয়া রহিয়াছেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করি নাই। যখন দারুণ গ্রীষ্মের প্রধান দূত খর রৌদ্র আমাদিগকে স্বস্থান-গমনে সত্বর করিল, তখন আমরা শরচ্চন্দ্রের বাক্যামৃত-পানে বিরত হইতে বাধ্য হইয়া প্রস্থানার্থ বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইতেছি এমন সময় অন্তঃপুরের সংবাদ-বাহক শরচ্চন্দ্র আসিয়া, মুক্তকেশীর জ্বরের তীব্রদাহ ও গ্রীষ্মের আতিশয্য জনিত অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মের সংবাদ দিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিলেন।

আমাদের অবস্থিতি নিবন্ধন তিনি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও প্রাবরণ মোচনের সুবিধা না পাইয়া, নাসিকা-নির্ম্মুক্ত বায়ুই গ্রহণ করিতেছিলেন, তাহার উপর জ্বরের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের উষ্ণতা তাঁহাকে ঘর্ম্মে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি লজ্জাশীলতার ব্যতিক্রম নাই। বস্তুতঃ এইরূপ সাধুশীলা বররমণীগণ লজ্জাকে প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ জ্ঞান করেন।

দেবী মুক্তকেশী যে সময় পুরাণ পরীক্ষার জন্য গৌহাটী নগরে পিতৃসন্নিধানে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের শাস্ত্রে অনধিকারের বিধান

দেখিয়া, পতিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসার্থ দুইটি সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করিয়া পত্র লিখেন, সে শ্লোক দুইটি এই,—

"কথং নু প্রত্যয়ানর্হা ভবন্তি কথয় স্ত্রিয়ঃ।
প্রাণেশ! পাপজন্মাসাং কথমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১।
ইদং ভাগবতং শাস্ত্রং পুরাণং ব্রহ্মসম্মতং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কথং ন শ্রুতিগোচরং॥ ২।"

সংস্কৃতজ্ঞ স্বামীও দুইটি শ্লোক দ্বারাই ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করেন; কিন্তু আর্ষ-ধর্ম্মশাস্ত্রে তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি না থাকায় শাস্ত্রমীমাংসিত সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আর্ষশাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলেও, অনার্ষসংগ্রহকারগণের প্রবর্ত্তিত নানা ভাবের শ্লোকমূলক ভ্রমাত্মক মত হইতে যাথার্থ্য নিরূপণ করা সহজ নহে, তবে সংগ্রহকারগণের গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আর্ষ-সংহিতাদির পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত সত্য উদ্ভাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহার মর্য্যাদার প্রত্যাশা বর্ত্তমান সমাজে নাই। সমাজ সংগ্রহকারের মতই শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছে।

মন্বাদি বিংশতি সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বিজত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের পত্নীগণের শূদ্রত্ব কোন্ মহর্ষি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, পরন্তু ইহা যুক্তিরও অধিগম্য বলিয়া বোধ হয় না। কেননা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণের কন্যা, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণেরই পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয়; ইহার মধ্যে কোন্ অপকর্ম্ম ইহাদিগকে পাতিত করে, তাহা কে বলিতে পারে?

"ত্রযোবর্ণা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয-বৈশ্যাঃ+ তেষাং মাতুরগ্রে

হৃদ্বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা-ত্বাচার্য্য উচ্যতে। বেদ প্রদানাৎ পিতেত্যাচার্য্য মাচক্ষতে।"

বশিষ্ঠসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ, অর্থাৎ ইহাদের দুইবার জন্ম হয়, প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে। দ্বিতীয় জন্মের মাতা সাবিত্রী, পিতা আচার্য্য।

দ্বিজ-বালকগণ উপনয়নান্তে গুরুকুলে বাস পর্য্যন্ত সেই দ্বিতীয় জন্মের পিতা যে আচার্য্য, তাঁহার সগোত্র ও সপিণ্ড হইয়া থাকে। বিদ্যা সমাপ্তির পর আচার্য্যের অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাহারা পুনরায় পিতার গোত্রাদি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তাহাদের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিজ-কন্যাগণের উপনয়ন সংস্কারের বিধি নাই, তজ্জন্য তাহারা যে ব্যবহারতঃ শূদ্রত্বকে অতিক্রম করিতে পারে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত কি না তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৪ অ।

ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা (প্রাধান্যাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা), ক্ষত্রিয়ের দুই ভার্য্যা (ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা), বৈশ্যের স্বজাতিজা বৈশ্যকন্যাই ভার্য্যা। তাহাতে উৎপন্ন অপত্যগণ পিতার সমান হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা তিন ভার্য্যাতে যে অপত্য উৎপন্ন হইবে, তাহারা পিতৃবর্ণ জাতি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীতে জাত পুত্র যেমন ব্রাহ্মণবর্ণ, সেইরূপ

ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রও ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ (যাহারা জমীদার ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত), বৈশ্যকন্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক (যাহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ) ব্রাহ্মণ বর্ণজাতি।

এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণও ক্ষত্রিয়বর্ণ, কেবল নামের প্রভেদ আছে মাত্র।

বৈশ্যের একমাত্র পত্নী বৈশ্যকন্যা, তাহাতে জাত পুত্রও পিতৃবর্ণ বৈশ্যজাতি।

ধর্ম্মতঃ শূদ্রা কোন দ্বিজবর্ণের বিবাহ্যা নহে, কেননা বেদমন্ত্রবিহিত সংস্কারে তাহাদের অধিকার না থাকার জন্য তাহারা দ্বিজবর্ণ পতির সবর্ণা বা সপিণ্ডা হইতে পারে না। এইজন্য কামপ্রবৃত্ত দ্বিজবর্ণের বিবাহিতা শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রগণ শূদ্রত্বকে অতিক্রম করিতে পারে না।

"নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যা মন্ত্রতো দশ॥"

ব্যাসসংহিতা।

এই কর্ণবেধান্ত নয়টি সংস্কার স্ত্রীদিগের মন্ত্রবর্জ্জিত, বিবাহ তাহাদের সমন্ত্রক; শূদ্রবর্ণের দশটি সংস্কারই অমন্ত্রক।

স্ত্রীগণের কেবলমাত্র বিবাহ সংস্কার সমন্ত্রক বলিয়া শূদ্রবর্ণের দশটি সংস্কার অমন্ত্রক বলাতে দ্বিজবর্ণের স্ত্রীদিগেরই বিবাহের সমন্ত্রকত্ব সূচিত হইতেছে। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থে উপনীত হইলে বোধহয় শাস্ত্রের মর্য্যাদা হানি হয় না, যথা—

দ্বিজ পুরুষগণের উপনয়ন সংস্কারে বেদে দ্বিতীয় জন্ম, গুরু-কুলে বাস, ব্রহ্মচর্য্য, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি যেমন শাস্ত্রবিহিত, সেই রূপ স্ত্রীদিগেরও বিবাহ-সংস্কারে বেদমন্ত্রে শ্বশুরকুলে দ্বিতীয় জন্ম, গুরুকুলে বাস। পতিসেবাই তাহাদের গুরুসেবা। পুরুষের যেমন অগ্নিপরিচর্য্যা, সেইরূপ স্ত্রীদিগেরও অগ্নি-পরিচর্য্যা; পুরুষ-দিগের যেমন অধ্যয়ন প্রয়োজন, স্ত্রীদিগের সেইরূপ গৃহকর্ম্ম। কেবল সমাবর্ত্তন স্ত্রীদিগের না থাকার জন্য তাহারা পুনর্ব্বার পিতার গোত্রাদি প্রাপ্ত হয় না।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়াঃ॥

মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্বিজকন্যাগণের এই বৈদিক বিবাহ-সংস্কার ছিল বলিয়াই পূর্ব্বকালে অসবর্ণা-বিবাহের বিধি ছিল। বেদমন্ত্রে অসবর্ণা স্ত্রীগণ পতির সাবর্ণ্য সাপিণ্ড্য প্রভৃতি প্রাপ্ত হইত। কলিতে যে তাহা শাস্ত্রকার ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ বেদমন্ত্রের যথোক্ত স্বর ও বর্ণের হীনতা। মন্ত্র সকল স্বর বা বর্ণ দ্বারা হীন হইলে সে অর্থ প্রকাশ করে না।

দ্বিজ-স্ত্রীগণের বেদে অধিকার ছিল কি না, তাহার প্রমাণার্থ বৃহদারণ্যক পাঠ করিলে সহজেই প্রচলিত মতের অমূলকত্ব প্রতীত হইবে। বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনবার বেদ বিচার করিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যও স্বভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বেদ বলিয়াছিলেন। যদি স্ত্রীদিগের শাস্ত্রানধিকার ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীর সহিত বেদবিচারে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?

যাহারা দ্বিজ-স্ত্রীগণের জন্য এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দ্বিজ-পত্নীকে শালগ্রাম স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু কোন্ যুক্তি ও শাস্ত্রবলে তাহাদিগের স্পৃষ্ট বা পক্ক অন্নদ্বারা সেই দেবতার ভোগ দিয়া থাকেন, এবং শূদ্রসমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণের যে পিতৃ-সবর্ণত্ব নির্দ্দেশ করেন, তাহারই বা যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ কি? শূদ্রাপুত্র পারশব প্রভৃতি শূদ্রবর্ণই হইয়া থাকে, সে কদাচ পিতৃসাবর্ণ্য প্রাপ্ত হয় না। তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণের অনস্তিত্বই শাস্ত্রতঃ প্রতিপাদিত হইয়া উঠে। যে মতে এইরূপ অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার ভ্রমপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রকৃত হৃদয়বান্ শাস্ত্রজ্ঞের অধিক কষ্ট করিতে হয় না। আধুনিকগণের বচন মধ্যে এই একটি—

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

বস্তুতঃ এই বচনটি কোন ঋষির নহে, অনার্ষ বচনের প্রভাব বর্ত্তমান সমাজের অস্থি-মজ্জার অভ্যন্তরে ক্রিয়া করিতেছে।

মনু বলিয়াছেন—

"শূদ্রেন হি সমস্তাবদ্যাবদ্বেদে ন জায়তে।"

'বেদে জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত শূদ্রের সমান' ইহা দ্বারা দ্বিজপুত্রের যেমন উপনয়নের পূর্ব্বে বেদাদিতে অনধিকারিত্ব খ্যাপিত হইতেছে, সেইরূপ দ্বিজকন্যার বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে বেদাদি শাস্ত্রে অনধিকারিত্ব খ্যাপিত হইতেছে। তাহা হইলে বিবাহের পূর্ব্বে দ্বিজকন্যাগণ ও উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজপুত্রগণ বেদাদিতে অনধিকারী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বচনের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেও এরূপ উচ্ছেদক অনর্থের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাহা না হইয়া

আধুনিক স্মার্ত্তগণকর্ত্তৃক একেবারেই স্ত্রীদিগের অনধিকারিত্ব ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

যে পরীক্ষার্থিনী দেবী মুক্তকেশী আমার সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম কয়েক পর্ব্ব গৌহাটী লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার তনু-ত্যাগের পর ভগ্নাশ শরচ্চন্দ্র আমাকে সেই পুস্তক প্রত্যর্পণ করিলে দেখিলাম, তন্মধ্যে যত সার ও সৎকথা আছে, তাহার প্রায় সমস্তই দেবীর হস্তাঙ্কিত চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত। যাঁহার ষোড়শ বর্ষমাত্র বয়সে এইরূপ সারগ্রাহিতা ও সৎকথা-লিপ্সা, তাঁহার বয়োবৃদ্ধি পৃথিবীতে যেরূপ উপাদেয় ভাবের বিস্তার করিত, তাহা চিন্তশীলের ভাবিবার বিষয়।

বস্তুতঃ আমরা এক একটি ইষ্টগুণে ভূষিতা পুর-রমণীর যশঃ-সৌরভ প্রত্যক্ষ করিলেও যুগপৎ বহু ইষ্টগুণের এইরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশের সম্বাদ আর পাই নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।

আমি মুসলমান। প্রায় এক যুগ অতীত হইতে চলিয়াছে, রাজসাহী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করিতাম। তখন রাজসাহী মাদ্রাসায় "আঞ্জামনে এস্লামিয়া" নামে একটী সভা ছিল। প্রতি শনিবারে তাহার অধিবেশন হইত। প্রত্যেক অধিবেশনে শরৎবাবু ও বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের আরও কয়েকটী সহৃদয় হিন্দু ছাত্র উপস্থিত হইতেন। সভায় আমিও উপস্থিত থাকিতাম। এই উপলক্ষে শরৎবাবুর সহিত আমার আলাপ

হয়। শরৎ বাবুর পরচিত্ত-আকর্ষণের মোহিনীশক্তিতে অভাগাকে এককালে বিমোহিত করিয়া ফেলে। আমি তাঁহার সংস্রবে কিয়দ্দিবস অভ্যন্তরেই বুঝিতে পারি, মানুষের যদি কিছু প্রাধান্য থাকে, তবে সে প্রাধান্য কেবল হৃদয়ের। মনুষ্য হৃদয়-বলেই বলীয়ান, হৃদয়-বলেই দেবতা। হৃদয়হীন মানুষে ও পশুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমি বিধর্ম্মী হইয়াও দেব-চরিত্র শরৎবাবুর সংসর্গে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাঁহার সহবাস ও সদালাপ আমাকে যে পর্য্যন্ত উপকৃত করিয়াছে, তাহা বিস্মৃতির সামগ্রী নহে। আমি চিত্তহীন অপদার্থ ব্যক্তি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারি নাই। নতুবা আমার দৃঢ় বিশ্বাস—হৃদয়শালী ব্যক্তি শরৎবাবুর সংসর্গে দেবত্ব লাভে সমর্থ; এবং তাঁহার অনুগ্রহ-ভোগী কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হইলে, সে কৃতজ্ঞতা অপর ব্যক্তিকে সহৃদয় করিতে পারগ।

শরৎবাবুকে আমরা জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতাম। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে অপার আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়া তিনি সংসারী হইলেন; শুভদিনে শুভক্ষণে তিনি মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। যথোপযুক্ত সম্মিলন তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে আরও অধিক আনন্দ প্রদান করিল। কিন্তু অভাগা মুসলমান হইয়াও যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল, শরৎবাবুর অপর বন্ধুবান্ধবের অদৃষ্টে সে অনুগ্রহ ও তৎপ্রসাদাৎ সন্তোষ-উপভোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া আমি অবগত নহি। মুক্তকেশী দেবী আমাকে পত্র লিখিতেন। তিনি আমাকে

কখন দর্শন করেন নাই, তবুও স্বামীর সুহৃদ্ ভাবিয়া আমা দিগের কুশল অবগতির জন্য পত্র লিখিতেন। কিন্তু তিনি এমনই স্বামিগতপ্রাণা এবং স্বভাবসিদ্ধ শুদ্ধাচারিণী ও সরল-হৃদয়া ছিলেন যে, একটীবারও শরৎবাবুর হস্ত স্পর্শ না করিয়া তাঁহার লিখিত পত্র আমার সমীপে আইসে নাই।

শরৎ বাবু হৃদয়ের যে মাহাত্ম্যে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন, স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবীও হৃদয়ের সেই মাহাত্ম্যে দেবীর আসন-গ্রহণে সমর্থা হইয়াছিলেন। স্বামীই তাঁহার ইহ ও পরজীবনের একমাত্র সহায় ও সুহৃদের স্থান অধি-কার করিয়াছিলেন। করুণাময় জগৎপিতা ও জনক জননীর পরে সংসারে স্বামী ব্যতীত তাঁহার আর উপাস্য কেহ ছিল না। সর্ব্বোপরি পিতৃমাতৃভক্তি এবং ঈশ্বরারাধনা ও তাঁহার কৃপার উপর অটল বিশ্বাস তাঁহার চরিত্রকে আরও অধিক উজ্জ্বল করিয়া-ছিল। ফলতঃ যে সকল গুণগ্রামে মণ্ডিত হইলে মানুষ দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন—দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, মুক্তকেশী দেবীতে সে সকল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সাধকে বলিয়া থাকেন—ঈশ্বর ভক্তির সামগ্রী, কিন্তু ভাল-বাসা ব্যতীত তাঁহাকে লাভ করা যায় না; ভগবান্ প্রেমেরই আয়ত্ত। আমার বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, যে প্রকৃত রূপে ভালবাসিতে জানে, জগৎ তাহারই আয়ত্ত; সংসারে সকলেই তাহার আত্মীয়। তোমার ক্ষমতা থাকে প্রেমের উৎস খুলিয়া দাও, ভালবাসার স্রোতে অবনী ভাসাইয়া দাও, সকলেই আত্মপ্রাণ তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া সুখী হইবে।

স্বামীর স্নেহে—স্বামীর প্রেমে বাধ্য হইয়া—আত্মহারা হইয়া স্বামীর অভাবে আত্মজীবন অসার ভাবিয়া—স্বামি-বিরহ অসহনীয় জানিয়া—পবিত্র প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কত ভারত-রমণী স্বইচ্ছায় প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বামীর চিতায় আত্মসমর্পণ করি। প্রেমের—সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করা অপেক্ষা জীবিত থাকিয়া হৃদয়ের সমস্ত বাসনায় চিরজীবনের জন্য জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক স্বামী বিয়োগে শুদ্ধাচারিণী হইয়া বৈধব্য-ব্রত পালন করাই অধিক গৌরবের বিষয় এবং কঠিন ব্যাপার। বৈধব্য-ব্রত-পালন কর্ত্রী রমণী দেবী অপেক্ষাও গৌরবের পাত্রী। *

পুরুষমাত্রেই রমণীর অভাবে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারের অসার সুখ সন্তোষ উপভোগ করিয়া থাকেন। স্ত্রীর পক্ষে সহমরণ আর পুরুষের পক্ষে দারাগ্রহণ, এ বিষয়ে পুরুষ চিরদিনই রমণী সমীপে অপদস্থ; শুধু অপদস্থ নহে—কৃতঘ্ন। পুরুষের এই পক্ষপাতিত্ব বড়ই দোষের কথা; এ লজ্জা লুকাইবার স্থান নাই। মুক্তকেশী দেবী ভারতে এ সম্বন্ধে এক নূতন পন্থা দেখাইলেন। মুক্তকেশী দেবীর বিরহে শরৎবাবু এযাবৎ একাহারী—হবিষ্যান্নভোজী! শরৎবাবু সংসারের সমুদায় সুখ-বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া বৈদার-ব্রত প্রতিপালন করিয়া জগৎকে

---

* হিন্দু সংস্কারক মহাশয় মনে রাখিবেন, কথাগুলি একজন মুসলমান বলিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশক।

প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বৈদার-ব্রত-প্রতিপালনে সংসারে শরৎবাবুই প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু এ বিষয়ে শরৎবাবুকে প্রশংসা করিতে যত প্রবৃত্তি না হয়, মুক্তকেশী দেবীকে শত মুখে প্রশংসা করিতে তাতোধিক বাসনা জন্মে। তিনি স্বামিহৃদয় আত্মগুণে বিমোহিত ও অধিকৃত করিতে না পারিলে কখনই এ নূতন কাণ্ডে জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত না।

আমাদিগের প্রবল বাসনা এবং ভগবানের সমীপে ঐকান্তিক প্রার্থনা—মুক্তকেশী দেবীর হৃদয় মাহাত্ম্যে এবং তাঁহার দেব চরিত্রের পবিত্রতায় বঙ্গের গৃহে গৃহে যেন তাঁহারই মত সতী লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাই।

শরৎ বাবুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের এখানে কিছু বলিবার নাই, কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে এরূপ দেব-হৃদয়-সম্পন্ন দম্পতি-যুগল হইতে সংসারে সংসারের সার বংশধর কেহ রহিল না!!!

শ্রীতালিমুদ্দীন।

হরিঃ—

রাজসাহী, ১৫ই এপ্রিল ১৮৯১ ইং।

প্রিয়তম শরৎবাবু

মুক্তকেশীর অমৃতময়ী জীবনকাহিনী পাঠ করিলাম, পাঠ করিতে করিতে ইহলোক পরলোকের ব্যবধান ভুলিয়া প্রাণ যে কোন্ অনির্ব্বচনীয় মহারাজ্য দর্শন করিল তাহা লিখিতে পারি-

তেছি না—আপনি অনেকবার পড়িয়াছেন, শুধু পড়িয়াছেন কেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, স্বহৃদয়ে নিশিদিন সাধনা করিয়াছেন—আপনি অবশ্যই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

মুক্তকেশী আজ বিদেহমুক্তির শান্তিময় দেশে ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্না, আমার পার্থিব সমাদর তত উচ্চ রাজ্যে উঠিতে অক্ষম, তাঁহার অর্দ্ধাত্মা অর্দ্ধাঙ্গ অর্দ্ধপ্রাণ আপনাতে আজিও মর্ত্ত্যভূমে বিরাজিত—আপনাকে বন্ধু বলিয়া সমাদর অনেকবার করিয়াছি; আশা মিটে নাই, তথাপি সজনে বিজনে, কথন মনে মনে কথন বা আপনার সাক্ষাতেও আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু আজ উদ্দেশে ভক্তিভরে বারম্বার আপনাকে প্রণাম করিলাম।

ভালবাসাই স্বর্গ এবং স্বর্গই ভালবাসা—অমর কবির অমৃতময়ী কবিতায় অনেকবার বাল্য হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছি। যখন প্রথম পড়ি, তখন তাহার গাম্ভীর্য্য বুঝিতাম না, আমি লৌকিক পার্থিব ইন্দ্রিয়-বিকারজনিত ভালবাসা মনে করিতাম এবং তাহাকে যে কবি কেন স্বর্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন বুঝিতাম না। ক্রমে বুঝিতেছি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমই স্বর্গ—তাহার সহিত পৃথিবীর সংস্রব থাকিলেও পার্থিব ক্ষুদ্রভাবের সংস্রব নাই।

আপনার জীবনের ব্রত যতই পালন করিতে পারিবেন ততই সেই মহাসম্মিলন ঘনীভূত হইবে, অথবা আমার ন্যায় অপ্রেমিকের মুখে সে উপদেশ শোভা পায় না। ভালবাসায় দূরত্ব নিকটত্বে পর্য্যবসিত হয়, স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়, ইহলোক পরলোক একত্র মিলিত হয়। প্রেমে মানুষ সেই জন্যই

সুন্দর হয়, পবিত্র হয় এবং জীবন্মুক্তি লাভ করে। সাধুরা বলেন

"প্রেম লয়ে যায় তাঁহার কাছে—এই প্রেম পবিত্র হলে।"

আপনি যে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন আমি তাহার তীরভূমির বালুকাস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া চক্ষু সার্থক করিতেছি, কিন্তু পিপাসা শান্ত করিয়া সেই অমৃতবারি পান করিতে পারি নাই। ইহা অতি বিনয়ের অভিমান নহে—আধ্যাত্মিক জীবনের শোকাবহ সত্য ঘটনা। আমি দেখিয়াছি অনেক—আপনাকে হয়ত অনেকবার বলিয়া থাকিব যে আমি অনেক সাধু সজ্জনের আনন্দধাম-যাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছি, নদীতীরে দাঁড়াইয়া লোকে যেমন পারযাত্রীদিগকে দেখে তেমনি সংসার-সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া মুক্তিপার-যাত্রীগণকে অমৃতধামে যাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু মুক্তকেশীর মহাপ্রস্থান অতি উচ্চ শ্রেণীর—নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল। আমার ন্যায় মহাপাপীর ক্ষুদ্র রসনা তাঁহার সদ্গতির জন্য কি প্রার্থনা করিবে—তিনি ভগবৎকৃপায় আপনিই সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চরিতাখ্যায়ক স্বয়ং ভগবদ্ভক্ত সাধুস্বভাব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অথচ মহাবৈরাগী, তাঁহার হস্তে পড়িয়া গ্রন্থখানি যে আরও উপাদেয় হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য—কিন্তু ইহা সাধারণ পাঠকের কিরূপ প্রীতিকর হইবে বলিতে পারি না। গ্রন্থ-সমাদরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তেমন পবিত্রচেতা পাঠকমাত্রেই সমাদর করিবে, ভক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের জয় ঘোষণা করিবে এবং আদ্যন্ত পাঠ করিতে করিতে ইহ পরকাল ভুলিয়া যাইবে। ইতি

চিরস্নেহাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মণঃ।

বোয়ালিয়া,

১৭ ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

যে পবিত্র আত্মা চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হইয়াছে, সে আর নশ্বর মানবের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে না। কিন্তু নির্ব্বোধ আমরা, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না; দুঃখে শোকে ব্যাকুল হইয়া তাহার স্মরণ-চিহ্ন রাখিবার জন্য যত্নবান্ হই। ইহা মানব-মনের স্বধর্ম্ম।

৺ মুক্তকেশী দেবী চলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন; আমি ক্ষুদ্র মানব, তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধুমাত্র, আমি আর তাঁহার জন্য কি করিতে পারি? যখন শরৎবাবুর সহিত ইহাঁর বিবাহের প্রস্তাব হয়, তখনই আমি ইহাঁর গুণের অনেক কথা শুনিতে পাই। অবশ্য সে গুণের এক অংশীদার আছেন। গুণ-সমূহ মুক্তকেশী দেবীতে নিহিত থাকিলেও তাহার একজন অংশীদার আজিও বর্ত্তমান আছেন। সে অংশীদার তাঁহার পিতা। কন্যাকে কি প্রকারে লালন পালন করিতে হয়, কি প্রকারে স্কুলে বা কলেজে না পাঠাইয়া, গৃহ-শিক্ষা দ্বারা বিদ্যাবতী করিতে হয়, শান্ত সুশীলা করিতে হয়, তাহা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় চূড়ান্তরূপে দেখাইয়াছেন। কন্যারও বাহাদুরী এই যে, তিনি তাঁহার পিতার যত্ন ও চেষ্টা কিছুমাত্র নিষ্ফল হইতে দেন নাই; তাহার কোন অংশ মরুভূমে জল-সিঞ্চনবৎ হয় নাই।

বিবাহের পর পুঠিয়া মোকামে, এই দম্পতী-যুগলের গৃহে, আমি একবার গমন করিয়াছিলাম। গৃহস্বামী শরৎবাবু চিরকালই

ভোলানাথ; কিন্তু গৃহকর্ত্রীর গুণপনা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পাঁচজন দাস দাসীর আড়ম্বর কিছুই ছিল না। মধ্যবিৎ গৃহস্থের যেমন থাকে তাহাই ছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র গৃহটী অন্দরে বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহ-সজ্জার জিনিস পত্রগুলি সংস্কৃত ও যথাস্থানে রক্ষিত। কলহ নাই, কোলাহল নাই, নীরবে গৃহ-কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। ভাই বঙ্গবাসী! তোমাদের কয়জনের জীবনে এই সুখ ঘটে? আমি সাধারণতঃ আমাদের স্ত্রীলোকের রন্ধন-পটুতার প্রশংসা করি না, কারণ আমার বিশ্বাস রন্ধন-পারিপাট্যে বঙ্গরমণীকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই; তাহা তাহাদের "একচেটিয়া" কার্য্য। এ সম্বন্ধে মুক্তকেশী দেবীও সুপটু ছিলেন।

ফলতঃ পরমেশ্বর উপযুক্ত মিলনই ঘটাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মহিমা অপার, কি কারণে তিনি অল্পদিন পরে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। একের অভাবে একটী সংসার যে কিরূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহা ভাবিতেও আমার হৃৎকম্প হয়। এ শোক-কাহিনী আর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। পরমেশ্বর সতীর আত্মার প্রতি শান্তিবিধান করুন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন আচার্য্য।

যে দেবী চরিত্রের পরিশিষ্ট লিখিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ, সে চরিত্র সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি আমার কোন-

কালেই ছিল না এবং এখনও নাই; অনেক সময় সে দেব-চরিত্রের কার্য্য দেখিয়াছি কিন্তু কার্য্যের উদ্দেশ্য, গাম্ভীর্য্য, স্নেহ, মমতা, প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা, সম্যক্ অনুভবের ক্ষমতাভাবে তাহার অর্থগ্রহণে সমর্থ হই নাই; কাযেই কার্য্যকারিণীর মূল্যও বুঝিতে পারি নাই—তাঁহাকে প্রাণ মনের সহিত আদর এবং যত্নও করিতে পারি নাই। অযত্ন হইয়াছিল বলিয়াই বুঝি আমরা অসময়ে এমন উজ্জ্বল রত্ন হারাইযাছি। সকল হস্তীতে মতি জন্মে না, সকল খনিতে কোহিনুর মিলে না, সকল বিলে পদ্ম জন্মে না, সকল মানুষ রাজা অথবা পণ্ডিত হয় না, সকল অর্থীর বাসনা পূর্ণ হয় না একথা যেমন সত্য, সকল পিতার ভাগ্যে মুক্তকেশীর মত কন্যা, সকল স্বামীর পক্ষে মুক্তকেশীর মত পত্নী এবং সকল লোকের অদৃষ্টে তাঁহার মত সখি জোটে না একথা ততোধিক সত্য। দেবী মুক্তকেশীর সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন তাঁহা-দেরতো কথাই নাই যাঁহারা পরোক্ষ এবং ব্যবধানভাবেও তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে এ কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন; ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মাদের লিখিত পরিশিষ্ট তাহার প্রমাণ। মুক্তকেশীর লিখিত কতকগুলি পত্র হইতে তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য দেখাইব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি স্থানান্তরে থাকাতে ঘটিল না; ভবিষ্যতে এ আশা পূর্ণ হইবে কি না জানি না। সামান্য দুই একটী কথা যাহা মনে হইল চরিতামৃতের পাঠক পাঠিকাগণকে তাহাই উপহার দিতেছি; বিরক্তিজনক হইলে লেখকের নিপুণতাভাব বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

বিবাহ এবং আত্মার যোগ—শরচ্চন্দ্রের বিবাহের প্রথম প্রস্তাবের পরই শ্রীহট্টস্থ কোন বন্ধুর মুখে কন্যার রূপ এবং গুণের কথা শুনিয়া আমরা বিবাহে মত স্থির করি। আমাদের দেশে বিবাহপ্রস্তাবে বর এবং কন্যার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রভৃতি অভিভাবকেরাই বিবাহসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু শরচ্চন্দ্রের সে প্রকার অভিভাবক কেহই ছিলেন না, পরামর্শস্থল কেবল কয়েকটি বন্ধু মাত্র। অন্য পক্ষে কন্যাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও বিশেষ উদার মতাবলম্বী, সুতরাং কার্য্যতঃ এই প্রস্তাব উপস্থিতের কিছুদিন পরেই ভাবী শ্বশুর ও জামাতাতেই পত্র দ্বারা বিবাহসম্বন্ধে সমস্ত কথা মীমাংসিত হইতে লাগিল। শুনিতে পাই বিবাহ স্থির হইতে লক্ষ কথার বিনিময় হইয়া থাকে, কিন্তু বিধিনির্দ্দিষ্ট এ বিবাহে তাহার শতাংশ বাক্য ব্যয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বিবাহ স্থিব হইল কিন্তু বিবাহের দিন ধার্য্য লইয়া কিছু গোল বাধিল; কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছা এবং চেষ্টা রহিল যত সত্বরে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শরচ্চন্দ্র মাতৃসমা মহারাণী শরৎসুন্দরীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে যাইবেন না। এই বিষয় লইয়া শ্বশুর জামাতাতে অনেক বাদানুবাদ চলে; এই সময়ের দুইটী বিষয় আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। (১) মুক্তকেশীর পিতা কন্যাকে কি প্রকারে শিক্ষিতা করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি আমার কন্যাকে বিবি সাজাইতেও ইচ্ছা করি না, আমার কন্যা কোণার বউ হইয়া থাকে ইহাও আমার ইচ্ছা নয়।" কন্যাকে সুযোগ্যা গৃহিণী

পতিরতা স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা এবং পরদুঃখকাতরা প্রতিবেশিনী করিতে কি কি শিক্ষার প্রয়োজন তিনি যে স্বীয় কন্যাকে তৎসমস্তই শিক্ষা দিয়াছিলেন শরচ্চন্দ্রের বিবাহের এবং মুক্তকেশীকে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি ঐ পত্রের ভাবে তাহা অনুমান করিয়াছিলাম; অনুমান মিথ্যা হয় নাই। (২) বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া কোন সময়ে মুক্তকেশীর পিতা অন্য স্থানে কন্যার বিবাহ দিবার কল্পনা মধ্যে মধ্যে মনে করিতেন; এই আভাস পাইয়া মুক্তকেশী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শরচ্চন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিবেন না; যদি পিতা নিতান্তই জেদ করেন তবে অগত্যা পিতাকে আত্মমত জানাইবেন। (একথা বিবাহের অনেক পরে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলাম)। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি এবং আত্মার যোগ ভিন্ন এ প্রকার আত্মসমর্পণ এবং প্রতিজ্ঞা বালিকার পক্ষে সম্ভব নহে। পুরাণাদিতে কথিত আছে শিবানী এই প্রকারে ভোলানাথে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর ইচ্ছা—সপত্নীক হইয়া খোরসেদপুরে আশ্রয়দাত্রী মাতার নিকট আইসেন। প্রাণসমা কন্যাকে এত শীঘ্রই এমন দূরদেশে পাঠাইতে অনিচ্ছা থাকিলেও জামাতার প্রস্তাবে শ্বশুর শাশুড়ী আপত্তি করিতে পারিলেন না; কিন্তু মুক্তকেশী নিজে, কিজন্য বলিতে পারি না, আসিতে অনিচ্ছুক; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কান্না ভিন্ন অন্য উত্তর নাই, সুতরাং কিছু বিরক্ত হইয়া শরচ্চন্দ্র একাই শিলচর হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

আমাদের দেশীয় যুবকগণ বিবাহ করিয়াই পত্নীর নিকট

হইতে পরিণত বয়স্কার সমস্ত ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহাতে অণুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই পত্নীকে শাস্তি এবং শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অভিমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।. আমার বোধ হয় আমাদের দেশের প্রায় সকল স্ত্রীলোকের অদৃষ্টেই এ ব্যবহার ঘটে; মুক্তকেশীও তাহা হইতে মুক্ত হইলেন না। বিবাহের পরবৎসর স্বামী পত্নীকে যে নিয়মে পত্র লিখিতে আদেশ ও অনুরোধ করিলেন কি কারণে জানি না, কার্য্যতঃ তাহার অন্যথাচরণ দেখিয়া স্বামীর মন অবজ্ঞার আশঙ্কা করিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু স্নেহ-প্রবণ শরচ্চন্দ্র জীবনসঙ্গিনীকে তাঁহার এই অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, অথচ অভিমানের খাতিরে বিশেষতঃ অযথা প্রশ্রয়ে ভাবি উচ্ছৃঙ্খলার ভয়ে নিজে লেখাও ভাল মনে করিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার উপরই এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন; কিন্তু আজ কাল করিয়া আমার লিখিতে কিছু বিলম্ব হইল; ইতিমধ্যে কথায় কথায় রহস্যচ্ছলে জনৈক বন্ধুর সহিত বাজি রাখিয়া শরচ্চন্দ্র তিনমাসকাল মুক্তকেশীকে পত্র লিখিবেন না প্রতিশ্রুত হইলেন; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎ এই সুদীর্ঘ তিনমাস স্ত্রীকে পত্র না লিখিয়া এবং তাঁহার পত্র না পাইয়া যে প্রভূত মনঃকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হন নাই। এত দীর্ঘকাল স্বামীর পত্র না পাইয়া মুক্তকেশীও বেশ বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং অনেকবার অসন্তুষ্টি নিবারণার্থ পত্র লিখিলেন কিন্তু পাঠাইতে পারিলেন না; কেননা অভিমান স্ত্রীলোকেরই স্বভাব! ইহাদের সমস্ত বিবাহিত

জীবনের—চারি বৎসরকালের সহিত তুলনায় এই তিনমাস কেবল সামান্য নহে। এজন্য আমার মনে অনেক সময় বড় বেশী কষ্ট হইয়া থাকে। পর বৎসর শরচ্চন্দ্র পত্নীকে খোরসেদপুর আনিলেন; তথায় মুক্তকেশীর ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির জন্য তাঁহাকে আপন আশ্রয়দাত্রী মাতার দৈনন্দিন ইষ্ট পূজার সময় নিকটে উপস্থিত থাকিতে উপদেশ দেন। বুদ্ধিমতী মুক্তকেশী একবার স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করিয়া তিনমাস যে কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বেশ স্মরণ ছিল; এই সময় হইতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর ছায়া ভিন্ন কিছুই অনুমান করিতে পারি নাই। একান্ত মনে প্রতিদিন উপাসনা দেখিলে নিজে উপাসনা না করিলেও প্রাণে ধর্ম্ম-ভাব উৎপন্ন হয় একথা অতি সত্য।

সরলতা, ভালবাসা এবং প্রেমে—ইহার পর মুক্তকেশীকে পুঠিয়া লইয়া যাওয়া হয়। খোরসেদপুরে শাশুড়ীর যত্নে মুক্তকেশী মাতৃবিরহ অনুভব করিতে পারেন নাই; আজ সেই মাতৃসমা শাশুড়ীকে ছাড়িয়া যাইতে মুক্তকেশীর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলেন এবং পথেও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না নিবারণের উদ্দেশ্যে শরৎ গল্পচ্ছলে বলিলেন "আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা নাটোর শিষ্যের বাসায় পঁহুছিব।" এই কথা শুনিয়াই মুক্তকেশী বলিলেন "সেখানে শিষ্যাণীকে দেখিতে পাইব?" ইহার অনুকূল উত্তর পাইয়া যেন তাঁহার সমস্ত কষ্ট দূরে গেল; অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে নাটোর ষ্টেশন হইতে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া

বাসায় গেলেন; কাপড় ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া আছেন; শিষ্যাণী কাজে ব্যস্ত, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অবসর পান নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রয়োজনীয় জিনিষ লইবার জন্য ঘরে আসিতেছেন এবং নিজ শাশুড়ীকে নবাগতার শুশ্রূষা করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতেছেন। আগন্তুকদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত হইলে শিষ্যাণী দেবী সমীপে আসিলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্রই মুক্তকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারই নাম কি সুশীলা?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ"। এতক্ষণ প্রাণের সখী শিষ্যাণীকে দেখিবার,—তাঁহাকে চিনিবার এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য যেন মুক্তকেশী ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, তাই তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যেন আর কোন সৌজন্যতা সম্ভাষণাদির অপেক্ষা সহিল না; বালিকার ন্যায় সরলতা মিশ্রিত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারই নাম কি সুশীলা?" এবং হাত ধরিয়া শিষ্যাণীকে নিকটে বসাইলেন। যে শিষ্যাণীকে দেখিতে পাইবেন আশায় সমস্ত পথ মনে আনন্দ করিতেছিলেন, শাশুড়ীর বিরহ ভুলিয়াছিলেন, এখন সেই শিষ্যাণীকে নিকটে উপস্থিত পাইয়া যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া দুই জনে একত্র শয়ন করিলেন, কিন্তু কেহই ঘুমাইলেন না, সমস্ত রাত্রি পরস্পর প্রাণ মন ঢালিয়া গল্প করিয়া কাটাইলেন। এই সময় শিষ্যাণী আদর করিয়া মুক্তকেশীর নাম "দেবীরাণী" রাখিলেন; ইহার পর হইতে শিষ্যাণী মুক্তকেশীকে "দেবীরাণী" বলিয়াই ডাকিতেন এবং তিনিও শিষ্যাণীর নিকট পত্র লিখিতে নীচে "দেবীরাণী"

বলিয়া নাম সই করিতেন। একবার মুক্তকেশী "আপনার হতভাগিনী দেবীরাণী" বলিয়া নাম সই করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণে ব্যথা পাইয়া শিষ্যানী লিখিলেন "স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা হওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণেই সধবা স্ত্রীলোক আপনাকে হতভাগিনী মনে করিতে পারেন না। তবে কি গুরুদেব আপনাকে ভাল বাসেন না? অন্যথা আপনার এ প্রকার আত্ম-সম্বোধনে অধিকার নাই।" ইহার উত্তরে দেবীরাণী লিখিলেন, "যে দিন আপনার গুরুদেবের প্রেমে বঞ্চিতা হইব, সেদিন এ দেহে এ প্রাণ থাকিবে না।" পুঠিয়াতে যাইয়া মুক্তকেশী ও শরচ্চন্দ্র উভয়েই পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে লাগিলেন, কোন মাসেই তাঁহাদের একাদিক্রমে সাতদিন অন্নাহার ঘটিত না। এই অবস্থা শুনিয়া মুক্তকেশীর পিতা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য পুঠিয়া আইসেন এবং কন্যার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে শিলচরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু পতিপ্রাণা মুক্তকেশী পিতার প্রস্তাবে এই উত্তর দেন:— "আমরা উভয়েই জ্বরে কষ্ট পাইতেছি; ইহাঁকে এমন অবস্থায় একা রাখিয়া আমি কোন মতেই আপনার সহিত যাইতে পারি না।" মুক্তকেশী ও শরচ্চন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে আমি তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য একবার পুঠিয়া যাই; আমাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে আমার উপস্থিতির পরদিনই শরৎ ও মুক্তকেশী উভয়েরই জ্বর হইল। জ্বর একাদিক্রমে আট দিন উভয়কেই কষ্ট দেয়। জ্বরের চতুর্থ কি পঞ্চমদিনে উভয়েরই এমন প্রবল বেগে জ্বর হয় যে মুক্তকেশী

অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; কিন্তু এ অবস্থায়ও স্বামীর কষ্ট এবং যাতনা দেখিয়া তিনি ডাক্তারকে ডাকিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছিলেন, এবং আমার বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইতেছিলেন। আমি দেখিলাম স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর জ্বর ও যাতনা অনেক বেশী, সুতরাং তাঁহারই শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু তাঁহার অধীরতায় স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে জগতে অমূল্য এক বন্ধুরত্ন পাই; তিনি কবিরাজ; তাঁহার শুশ্রূষাগুণে ও তত্ত্বাবধানে রোগীদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হয়। তদ্ভিন্ন স্বর্গীয় ডাক্তার কৈলাস-চন্দ্র মজুমদারের নিকটেও এই দম্পতী বিশেষ ঋণী আছেন মুক্তকেশী যখন পুঠিয়া পরিত্যাগ করিয়া পিতার সহিত গৌহাটী যান; সেই সময় শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার স্নেহের বৃন্দাবন মুক্তকেশীকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। পথে নাটোরে শিষ্যাণীর সহিত শেষ দেখা করিয়া যান। গোয়ালন্দে ষ্টীমারে উঠিবার পূর্ব্বে ষ্টীমারে অনাহারজনিত কষ্ট স্মরণ করিয়া শরতের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, তিনি সাশ্রু নয়নে বলিলেন "হা ঈশ্বর! চারি দণ্ড বেলার সময় আহার না করিলে যিনি অস্থির হন, সেই ভগ্নস্বাস্থ্য মুক্তকেশী কেমন করিয়া দুই দিন ষ্টীমারের অনাহার-কষ্ট সহ্য করিবেন, এবং কেমন করিয়াইবা বাঁচিয়া থাকিবেন!" ইহা শুনিয়া অশ্রু পরিপ্লুতা মুক্তকেশী উত্তর করিলেন "নাথ! আপনাকে না দেখিয়াই যদি জীবিতা থাকিতে পারি, তাহা হইলে সামান্য অনাহারে দাসী কিছুই করিতে পারিবে না।" নাটোর হইতে যাইবার সম

পতির নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানা পত্র শিষ্যাণীকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া যান এবং প্রতিশ্রুতিমত গৌহাটী হইতে ভর্ত্তার লিখিত একখানা পত্র পাঠাইয়া দেন এবং পাঠান্তে ফেরত পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া লেখেন ;—"ইহার এক এক খানি পত্র আমার নিকট এক একটী স্বর্গের বার্ত্তা লইয়া আইসে।" এ প্রকার পতিপ্রেম, পতিভক্তি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অতি অল্পই দেখা যায়। শিষ্যাণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, বোধ হয় প্রাণে প্রাণে এবং মনে মনে মিলিয়া গিয়াছিল ; শিষ্যাণীর নিকট কোন কথাই গোপন থাকিত না। তাই মুক্তকেশী স্বর্গারোহণ করিয়া স্বর্গের অতুল সুখ দেখিয়া প্রাণের সখীকে ছাড়িয়া সে সুখ সম্যক অনুভব ও উপভোগ অসম্ভব মনে করিয়াই বুঝি মর্ত্ত্যের তিন বৎসর মধ্যে শিষ্যাণীকে সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। একবার আমি তাঁহার শিষ্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমার পরিচিত যত স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কে?" তিনি দুই তিন জনের নাম করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মুক্তকেশীর নাম না থাকাতে আমি বলিলাম "ইহাঁরা কি তোমার দেবীরাণী অপেক্ষাও ভাল?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "দেবীরাণী সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তুলনীয়া নহেন, তাঁহার নাম অপরের সহিত করিব কেন?"

মুক্তকেশী গৌহাটী হইতে আমাকে যে সকল অমৃতবর্ষি পত্র লিখিয়াছিলেন, বাহুল্যভয়ে আমি তাহার কিছুই উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

মরুভূমিতে শীতল জলের ন্যায়, মহানগরী কলিকাতায় বন্ধুরত্ন শরচ্চন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলাম। হৃদয় তখন একজন বন্ধুর জন্য লালায়িত হইয়াছিল। কারণ আমি তখন অতি অল্পদিন মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছি। একটী মহানগরীকে মরুভূমির সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে,—সকলেই আপনার জন্য ব্যস্ত, অন্যের দিকে তাকাইবার কাহারও অবকাশ নাই। এরূপ স্থান মৎপ্রকৃতিক ব্যক্তির পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বুঝিয়াই যেন বিধাতা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার সহিত মিলিত করিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শরৎবাবুর সহিত সামান্য আলাপ হয়, কিন্তু সেই আলাপেই তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনাগুলি শুনিয়া তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর দেখা শুনা ছিল না। পরে উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সহিত পুনর্দর্শন হয়।

দিন দিন তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার চরিত্র সেই সময়ের মধ্যেই গঠিত হইয়াছিল। সে চরিত্র সাধারণ মনুষ্য-চরিত্র নহে—সর্ব্বাংশে দেবোপম। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণই যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া অনেক সময় নিজের প্রকৃতিগত অভাব সকল দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইতাম।

শরৎবাবু প্রথমতঃ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন। বিবাহ করা উচিত কি না সেই সন্দেহ নিরাকরণ মানসে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করেন। যখন দেখিলেন বিবাহ না করিলে পূর্ণ মনুষ্য

হওয়া অসম্ভব, তখন বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আমার বেশ স্মরণ নাই, কিন্তু বোধ হয় বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি তাঁহার পূর্ব্বেই বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলাম, এবং আমাদের মত লোকের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য কি না সে বিষয় অনেকবার ভাবিয়া বিবাহ না করাই উচিত মীমাংসা করিয়াছিলাম। বিশেষ শরৎবাবুর হৃদয়ের উচ্চতা দেখিয়া যাহাতে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ না হন, কেবল পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিয়া লোক-শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী থাকেন, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। সেই জন্য স্বার্থান্ধ হইয়া অনেক সময় বিবাহের প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু যখন শুনিলাম যে, যে কুমারীর সহিত শরৎবাবুর বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, তিনি একটী রত্ন--সর্ব্বাংশেই শরৎবাবুর উপযুক্ত, তখন বিবাহে যে দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহা মন হইতে দূর হইল।

সময়ে মুক্তকেশী শরৎবাবুর অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার অধিকার নাই। আমি একটী কথাই যথেষ্ট মনে করি— যিনি সন্ন্যাসীকে গৃহী করিতে পারিয়া-ছিলেন, তিনি কখনই মানবী ছিলেন না। তাঁহার সুশিক্ষাদি সদ্‌গুণের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন তাঁহার অভাবে শরৎবাবুর কি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহত বাঙ্গালী-জীবনের নিত্যকর্ম্ম। অথচ বিপত্নীক শরচ্চন্দ্র পুনঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার

যে অভাব হইয়াছে সে অভাব পূরণ আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। হৃদয়ের যে স্থানে দেবী মুক্তকেশীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে স্থানে আর কাহাকে বসাইবেন? সে স্থান লাভ করিতে যদি কাহারও অধিকার থাকে, তবে সে কেবল পর-হিতৈষণা-প্রবৃত্তির।

শরৎবাবুর বিবাহকালে সন্ন্যাসী গৃহী হইলেন দেখিয়া মনের উচ্ছ্বাসে একটী ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহা অনুরুদ্ধ হইয়া এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

A SONG HYMENEAL.

The moon shone bright in yonder sky,
In beauteous splendour clad;
The cuckoo from her leafy bower
Made all around so glad.

Thick-laden with the flowery sweets
Did Zephyr gently blow :—
Glad Nature in her gladness wore
Her richest festal show.

The moon shines fairer than of yore,
No cuckoo sang so sweet;
Dame Nature, in her newest shape,
Did Sarat's vision greet.

But who wrought forth this sudden change,
Who did so powerful prove ?
Was not the cause his Loved-one's smile ?
Such magic Power's in Love !

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসাম—গৌহাটী—"গৌহাটী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা, পুঠিয়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ৩২ এ শ্রাবণ ওলাউঠা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। কপালে হরিনাম, ললাটে সিন্দূর এবং বাহুতে পতিনাম ধারণ করিয়া সতী চিতাভূমে নীত হয়েন, তাঁহার দেহ নির্জ্জনে কদম্ব বৃক্ষের তলে দাহ করা হয়। মুক্তকেশী সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। আগামী ফাল্গুন মাসে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের নিয়মানুসারে পুরাণবিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সংস্কৃত চণ্ডী এবং বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল, মূল রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নানা অংশ তিনি অভ্যাস করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি রমণী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করেন। তিনি গৃহকর্ম্মেও কুশলা ছিলেন। অল্প কথা কহিতেন। স্বভাব ধীর এবং স্থির, চোক মুখ তুলিয়া উচ্চডাকে তিনি কোন কথা কহেন নাই

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লজ্জা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন। মুক্তকেশীর অকাল মৃত্যুতে অনেকেই আজ শোক-সন্তপ্ত।”—“বঙ্গবাসী”—১৭ই ভাদ্র। ১২৯৫। ১লা সেপ্টেম্বর। ১৮৮৮। (মফঃস্বল সম্বাদ-স্তম্ভ)।

“পুঠিয়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী সম্প্রতি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই মহিলার নাকি স্মরণশক্তি এতদূর প্রখর ছিল যে, তিনি যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। তিনি নাকি সংস্কৃত কালেজের পুরাণ-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমাদের বিবেচনায় বি, এ, মেয়ে মানুষদের অপেক্ষা ইহাঁর কিম্মত বেশী।”—“অপূর্ব্বপঞ্চাবৎ”—২২ শে ভাদ্র। ১২৯৫। ৬ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮৮। (বিবিধ সম্বাদস্তম্ভ)।

“Sreemati Muktakesi Debi.—We had recently to record the death of Pandit Iswar Chandra Vidyasagara's wife. It is with pain we chronicle this week the demise of another eminent Indian lady. Her name heads the note. She was the wife of Babu Sarat Chandra Choudhuri of Puthia in Bengal, and has died young. She was possessed of uncommon memory and talents. She could,

it is said, recite accurately, without missing a word or syllable, whatever she read once, rivalling almost Pondita Rama Rai in that respect. She was perfectly at home in our difficult Sanskrit language and literature, and was just preparing to compete for the Puranik Examination Certificate of Sanskrit College, Calcutta. We deeply regret the loss her friends and relatives—and country—have sustained."—"National Guardian" —September 14, 1888. (Editorial Notes.)

যত্নাদ্বৈ পরিসঞ্চিতৈঃ প্রতিদিনং ভোগোপচারৈঃ খলু
যাং সন্তোষ্য সুখান্বিতাপি সুহৃদাং তৃপ্তিং ন যাতা মুদা।
তামদ্যেহ চিতাস্থকাষ্ঠশয়নে সন্ন্যস্য জীবচ্যুতাং
কো হা হন্ত দদাতি দীপ্তমনলং প্রেম্নৈব তস্যা মুখে ॥ ১
যাং দৃষ্ট্বা পরিতার্পিতাঃ পরিজনাঃ শান্তিস্রবোদ্বর্ষিণীং
যদ্ভাষাঞ্চ নিশম্য ভাবমধুরাং প্রীতিং গতা বান্ধবাঃ।
যামুদ্দিশ্য শুভৈষিণো গুরুজনা আশাং বিশালাং গতাঃ
সাদ্যৈষা ভবপারগা প্রণয়িনঃ প্রেমাশ্রুভিস্তৃপ্যতাং ॥ ২

কস্মৈচিৎ

সম্পূর্ণ।